অসময়ের বৃত্তান্ত

অভীক দত্ত

অসময়ের বৃত্তান্ত

১ ।। ভূমিকা ।।

সন ১৫৩১। দিল্লির সিংহাসনে আসীন বাদশাহ হুমায়ন। পিতা বাবরের মৃত্যু হয়েছে সদ্য। শিল্পপ্রিয় এবং খামখেয়ালি বাদশাহকে নিয়ে দিল্লির হাওয়া কিঞ্চিৎ বিক্ষিপ্ত।

যদিও আমাদের গল্প বাদশাহকে নিয়ে নয়।

চোখ রাখা যাক বাংলার দিকে।

বীরভূমের কোনও এক গ্রাম।

হিন্দুপ্রধান।

হরি মিশ্র পূজারী বামুন। প্রবল গ্রীষ্মের দুপুরে মন্দিরেই বিশ্রাম নিচ্ছিলেন।

গ্রামের প্রবেশপথে শিবমন্দির। গ্রামে প্রবেশ করতে হলে মন্দিরের পথ ধরে প্রবেশ করতে হয় যদি কেউ পশ্চিম দিক থেকে আসে। গ্রামটি তার আশেপাশের গ্রাম থেকে একটু দূরত্বে অবস্থিত।

হরি মিশ্রের ঘর মন্দির সংলগ্ন। বামনী কাত্যায়নী এবং তাঁদের একাদশবর্ষীয়া কন্যা রাধা। হরির একমাত্র ছেলে বিশ্বম্ভর জীবিকার সন্ধানে কাশীতে গেছিল তিন বছর আগে। আপাতত ওখানেই এক টোলে পণ্ডিতি করে। ছ মাস সাত মাসে একবার করে আসে।

বিশ্বম্ভরের বিয়ে হয়েছিল গ্রামেরই এক মেয়ের সঙ্গে। বেনারসে যাবার পাঁচ মাসের মধ্যে স্ত্রীকে নিয়ে চলে যায়। তার চার পুত্র।

হরি পঞ্চাশোর্ধ্ব। রাধা তাঁর বেশি বয়সের সন্তান। স্বাভাবিকভাবেই কন্যাস্নেহ বেশি। মেয়ের বিয়ের বয়স হয়ে গেলেও হরি গড়িমসি করে যান। কাত্যায়নী মেয়েকে নিয়ে বেশিরভাগ সময় বড়োই চিন্তা করেন। বিশ্বম্ভরও বাবাকে ঠারেঠোরে বুঝিয়েছে, যদিও হরি এই প্রসঙ্গ উঠলেই হেসে বলেন, সবই জগজ্জননীর ইচ্ছা, তিনি চাইলে সবই হবে। এই ব্যাপারে আর কেউ চিন্তা না করলেও হবে।

মন্দিরের বাইরেই চণ্ডীমণ্ডপ। গ্রামের বয়স্ক লোকেরা এসে গল্পগুজব করেন। আপাতত প্রবল দাবদাহে কারও দেখা নেই।

হরির ঝিমুনি মতন এসেছিল। ঘোড়ার পায়ের শব্দে চোখ খুলে দেখলেন এক অশ্বারোহী গ্রামের দিকে ছুটে আসছে।

হরি ধড়মড় করে উঠে বসলেন।

এক দীর্ঘদেহী পুরুষ ঘোড়া থেকে নামলেন। নেমেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন।

হরি মিশ্র তড়িঘড়ি এগিয়ে গিয়ে দেখলেন এক মুসলমান যোদ্ধা। সম্ভবত দীর্ঘ পথশ্রমে এবং তীব্র দাবদাহে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।

তিনি মন্দিরের ভিতরের কলস থেকে জল নিয়ে এসে দূর থেকে চোখে মুখে ছেটালেন। বেশ কিছুক্ষণ পরে যোদ্ধার জ্ঞান ফিরল।

তিনি কোনওমতে জলের দিকে ইঙ্গিত করে বোঝালেন তাঁর আরও জলের প্রয়োজন।

হরি গলা ছেড়ে রাধাকে জল নিয়ে আসার জন্য বললেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই কাত্যায়নী এবং রাধা কলসি নিয়ে হাজির হলেন।

কাত্যায়নী মুসলমান যোদ্ধা দেখেই তড়িঘড়ি ঘোমটা দিলেন।

রাধা কলসি বাবার কাছে নিয়ে এসে কৌতূহলভরে মুসলমান যোদ্ধাকে দেখতে থাকল।

কাত্যায়নী ধমকের সুরে বললেন, "ঘর যা রাধা। তোর বাবার তো বুদ্ধিশুদ্ধি হবে না কোনও দিন।"

যোদ্ধা কোনও দিকে না তাকিয়ে কলসি নিয়ে অনেকটা জল খেয়ে ফেললেন।

কাত্যায়নী হতাশ গলায় বললেন, "গেল কলসিটা। আগে জানলে..."

জল খেয়ে যোদ্ধাটি অজানা কোনও ভাষায় (পুস্তু ভাষা) হরিকে কিছু বললেন। হরি বুঝলেন না। কাত্যায়নী রাধাকে নিয়ে ঘরে গেলেন। দীর্ঘদেহী সুঠাম চেহারার মালিক। হরি বেশ মুগ্ধ হয়ে যোদ্ধাটিকে দেখতে লাগলেন।

যোদ্ধার ভাষা যদিও কিছুই বুঝতে পারছিলেন না তিনি।

যোদ্ধাটি বেশ খানিকক্ষণ তাঁর দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন, "জলিল খান। জলিল খান।"

হরি বুঝলেন যোদ্ধাটির নাম জলিল খান।

জলিল খানের ঘোড়াটি ভদ্র সভ্য। কোথাও পালিয়ে যায়নি।

জলিল উঠে ক্লান্ত দেহ ঘষটে ঘষটে ঘোড়াটিকে বাঁধলেন। অশ্বত্থ গাছের তলায় বসে হরির দিকে কিছু খেতে দেওয়ার কথা আকারে ইঙ্গিতে বোঝাতে লাগলেন।

হরি কিছুক্ষণ সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগলেন। তারপরে দ্রুতবেগে নিজের ঘরের প্রতি ধাবমান হলেন।

কাত্যায়নী গম্ভীর হয়ে বসে ছিলেন। তাঁকে দেখেই ফোঁস করে উঠলেন, "আপনাকে কিছু বলার নেই আমার।"

হরি বিচলিত কণ্ঠে বললেন, "বিবাদ পরে কোরো। কিছু খাবার থাকলে দাও।"

কাত্যায়নী ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে হরির দিকে তাকিয়ে বসে রইলেন। হরি নিজেই হাঁড়ি থেকে কিছুটা ভাত আর শাক একখানি কলাপাতায় নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। রাধা বাপের পিছন পিছন যাবে ঠিক করেছিল, কাত্যায়নীর মুখ দেখে আর যাবার সাহস করল না।

জলিল সবখানি খাবার খেয়ে গাছের তলাতেই নিদ্রা গেলেন।

বিকেল নাগাদ গ্রামে খবর হলে গ্রামের সবাই দল বেঁধে চণ্ডীমণ্ডপে এসে হাজির হল।

হরিকে বিদ্যাচরণ ডেকে বললেন, “ছোঁয়াছুয়ি হয়নি তো ঠাকুর?”

হরি একগাল হেসে মাথা নাড়লেন, “কী যে বলেন!”

বিদ্যাচরণ বললেন, “এ পেয়াদা কোত্থেকে এয়েচে? এখেনেই থাকবে?”

হরি জলিলের দিকে তাকিয়ে বললেন, “ভাষা তো কিছুই বুঝি না। তবে থাকবে না মনে হয়। রাতেই দেখবেন চলে যাবে।”

বিদ্যাচরণ মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, “ভারী অলুক্ষুনে হে হরি। ম্লেচ্ছ পেয়াদা ভারী অলুক্ষুনে। দেখো সাবধানে।”

সবাই নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে জলিল খানকে দেখতে লাগল।

সন্ধে নাগাদ জলিল উঠে কলসির বাকি জলটুকু খেয়ে ঘোড়ায় উঠে গ্রাম ত্যাগ করলেন।

সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল। বিদ্যাচরণের নেতৃত্বে চণ্ডীমণ্ডপসহ গোটা চত্বরটা গোবর (গোবর দিয়ে নিকোনো হয়, ধোয়া যায় না।) এবং গঙ্গাজল দিয়ে ধোয়া হল।

সন্ধ্যারতি হবার পরে সব গ্রামবাসী যখন ঘরে ফিরে গেল, হরি দেখলেন জলিল ফিরে এসেছেন।

তিনি জলিলের কলসিতে জল ভরে দিলেন।

কাত্যায়নীর রক্তচক্ষু আরও একবার উপেক্ষা করে জলিলকে খেতে দিলেন। জলিল খেয়েদেয়ে গাছতলাতেই ঘুমিয়ে পড়লেন।

পরের দিন সকালে হরি ঘুম থেকে উঠে আবিষ্কার করলেন, রাধা এবং জলিল, কেউই নেই।

২ ।। বর্তমান সময়।।

আদিত্য গাড়ি বের করছিল। সবে গাড়ি চালানো শিখে নতুন গাড়িটা কিনেছে। সাবধানে চালাতে হয়। এখনও মাঝে মাঝে ব্রেক আর অ্যাক্সিলারেটর গুলিয়ে ফ্যালে।

রুমকি দরজায় তালা দিয়ে গাড়িতে উঠল। হালকা গলায় বলল, “দেখো, ঠিকঠাক পৌঁছোতে পারবে তো?”

আদিত্য বলল, “দেখাই যাক।”

গাড়ি চালানোর সময় কোনও কথা বলে না আদিত্য।

মাথা ঠান্ডা করে চালাতে হয়। অন্য কোনও দিকে মন দিলে হবে না।

শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে। কলকাতার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত। সাবধানে না চালালে চিত্তির।

রুমকির ফোনে ফোন আসছিল বাড়ি থেকে। মাঝে মাঝেই ফোন বের করে রুমকি "হ্যাঁ এই তো রুবি" "এই তো সাইন্স সিটি" করে যাচ্ছে।

ঘণ্টাখানেক লাগল শ্বশুরবাড়ি পৌঁছোতে।

বাড়িতে পুজো হচ্ছে। রুমকি ঢুকেই ঠাকুরঘরে চলে গেল। রুমকির বাবা পুজো করছেন।

আদিত্য বসার ঘরে বসল। ঝুমকি বসে বসে মোবাইল ঘাঁটছে। অন্যান্য দিন তাকে দেখলেই ঝুমকি একগাদা প্রশ্ন করে। আজ শুধু হাসল।

আদিত্য বলল, "কী ব্যাপার রে? মুড অফ কেন? পুজোর ওখানেও যাসনি!"

ঝুমকি বলল, "কিছু না দা, শরীরটা একটু খারাপ, এই যা।"

আদিত্য বুঝল পিরিয়ডস সংক্রান্ত কোনও ব্যাপার হবে হয়তো। সে আর কিছু বলল না।

ঝুমকি বলল, "তোমরা নৈনিতাল কবে যাচ্ছ যেন?"

আদিত্য বলল, "কেন? তোর দিদিয়া তোকে বলেনি?"

ঝুমকি বলল, "দিদিয়া তো সময়ই পায় না আজকাল কথা বলতে।"

আদিত্য বলল, "তা ঠিক। তোর দিদিয়া সর্বক্ষণ বই নিয়ে ব্যস্ত। ইউনিভার্সিটির এক্সামটা শেষ হলে বাঁচি।"

ঝুমকি বলল, "আর আমি? ফার্স্ট ইয়ারের যে কী চাপ তা আর তোমাকে কী বোঝাব! মাঝে মাঝে মনে হয় গলাজলে বসে থাকি।"

আদিত্য হাসল। বলল, "বিয়ে করে নে তাহলে। পড়াশোনা করতে হবে না।"

ঝুমকি ছদ্ম আগ্রহী গলায় বলল, "হাতে ভালো পাত্র আছে নাকি?"

আদিত্য বলল, "আছে তো। বলব কথা?"

ঝুমকি বলল, "প্লিজ বলো। দেখতে কেমন? হৃতিক পুরো?"

আদিত্য বলল, "একদম। রূপে কার্তিক, গুণে কী যেন বলে..."

ঝুমকি ছদ্ম রাগে বলল, "হুঁ, সেই তো হুঁকোমুখো হ্যাংলা ধরে নিয়ে আসবে একটা।"

ঝুমকির মোবাইলে ঘন ঘন মেসেজ টোন বাজছে।

আদিত্য বলল, "কে রে? প্রেম-ট্রেম করছিস নাকি?"

ঝুমকি একটু চমকাল, পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে বলল, "না না, ধুস, কী যে বলো।"

আদিত্য বলল, "তবে?"

ঝুমকি বলল, "কলেজের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ। সারাক্ষণ কিছু না কিছু আসছে।"

আদিত্য বলল, "ও। আমারও অনেকক্ষণ হোয়াটসঅ্যাপ চেক করা হয়নি বটে।"

আদিত্য মোবাইল বের করল। দুজনে বেশ কিছুক্ষণ মোবাইলে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ পরে পুজো শেষে রুমকি বসার ঘরে এসে আদিত্যকে দেখে বলল, “এ কী! আবার মোবাইলে ব্যস্ত হয়ে পড়লে তুমি? তোমার শালিকে নিয়ে গল্প তো করতে পারতে!”

আদিত্য বলল, “উনিও তো ওতেই ব্যস্ত।”

রুমকি ঝুমকির মোবাইলের দিকে দেখে রাগ করল, “দেখেছিস? আমি বাবাকে বারবার বারণ করলাম তোকে যেন স্মার্টফোন এখনই না কিনে দেয়, ঠিক কিনে দিল, না? এইজন্য আমি বাড়ির ব্যাপারে আজকাল আর কিছু বলি না। আমার কথা কেউ শোনেই না আজকাল!”

ঝুমকি বলল, “আমি একদম বেশি নেট করি না দিদিয়া, বিশ্বাস কর!”

রুমকি বলল, “যা ইচ্ছা কর। আমার কী!”

আদিত্য বলল, “বেরোব এখন?”

রুমকি বড়ো বড়ো চোখ করে আদিত্যর দিকে তাকিয়ে বলল, “এখনই যাবে? খাবে না?”

আদিত্য বলল, "প্রসাদ হয়েছে? আমাকে আবার কতটা ড্রাইভ করতে হবে!"

রুমকি বলল, "হবে না কেন! বসো। খেয়ে যাও। এই মেয়ে, যা ওর খিচুড়িটা নিয়ে আয় শিগগির।"

ঝুমকি উঠে ঘর থেকে বেরোলে রুমকি বলল, "দেখেছ? ঠিক মোবাইল দিয়ে দিল বাবা ওকে। কতবার বলেছি।"

আদিত্য বলল, "দিয়েছে ভালো করেছে। সব বন্ধুরা স্মার্টফোন নিয়ে ঘুরবে আর তোমার বোন গরিবের কমদামি ফোন নিয়ে ঘুরবে? তুমিও যেমন।"

রুমকি মুখ ভার করল, "যাক গে, তুমি সাবধানে যাবে। আর শোনো, রাত্তিরে আবার বোতল খুলে বোসো না যেন।"

আদিত্য বলল, "না না, তুমি না থাকলে আমি বোতল খুলি না তো! জানো না?"

রুমকি মুখ বাঁকাল, "হ্যাঁ, ওই আনন্দেই আছি আর কি।"

ঝুমকি প্রসাদ নিয়ে এসেছিল। আদিত্য খেতে খেতেই বলল, "বাবা মাকে দেখছি না?"

রুমকি বলল, "আরও কী সব লোক এসেছে, বাইরে আছে। তুমি যাবার সময় দেখা করে যেয়ো, তাহলেই হবে।"

আদিত্য খেয়ে শ্বশুর শাশুড়ির সঙ্গে দেখা করে বেরোল।

বেশি রাত করে সে শহরের রাস্তায় গাড়ি চালাতে চায় না।

#

পরদিন অফিসে ছিল আদিত্য। দুপুর দেড়টা নাগাদ দেখল রুমকি ফোন করছে। বিরক্ত হল খানিকটা। মেয়েটা অফিস আওয়ারস বুঝতে পারে না। ধরল, "বলো, আবার কী হল।"

রুমকি ওপাশ থেকে ধরা গলায় বলল, "সর্বনাশ হয়েছে দিত্য। তুমি যত তাড়াতাড়ি পারো এ বাড়ি এসো।"

৩

সরু গলি। গাড়িটা দাঁড় করানোর পর অনেকটা হাঁটতে হয়।

ঝুমকি গাড়ি থেকে নামল। রিন্টু বলল, “চ।”

ঝুমকি ইতস্তত করে বলল, “তোমার বাড়ি থেকে ঝামেলা করবে না তো?”

রিন্টু ঝুমকির হাত ধরল, “ধুস। চ তো।”

ঝুমকি হাত ছাড়িয়ে নিল না। তার ভালো লাগছিল সব কিছুই।

সকাল থেকে তাকে অনেক অভিনয় করতে হয়েছে। গয়নাগাঁটি যা ছিল সব খুলে খাটের ওপর রেখে ক্লাস টেন আর টুয়েলভের সব সার্টিফিকেট, ভোটার আই কার্ড, আধার কার্ড কলেজের ব্যাগে নিয়ে নিয়েছে। মাসের হাতখরচটা নিয়েছে। রিন্টু বলেছিল কোনও জামাকাপড় না নিতে। সব কিনে নেওয়া যাবে। ঝুমকি কিছুই নেয়নি। একটা চিঠি রেখে এসেছে শুধু, “আমি বিয়ে করছি মা। আমার সঙ্গে কোনও দিন আর যোগাযোগ রেখো না। জানি আমি খুব খারাপ।” ব্যস, এটুকুই।

বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় যেভাবে রোজ তাড়াহুড়ো করে খায় সেভাবেই খেয়েছে। রুমকি ঘুমোচ্ছিল। আগের দিন পুজো করে ক্লান্ত ছিল। ঝুমকি রুমকির ঘরে গিয়ে ওকে আদর করে এসেছে।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাসরাস্তায় রিন্টু একটা গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। নিজেই চালিয়ে এসেছিল। ঝুমকি সে গাড়িতে উঠতেই রিন্টু গাড়ি স্টার্ট দিয়েছিল। সারা রাস্তা খুব বেশি কথা হয়নি। ফোন বাজছিল তার মাঝরাস্তায়। ঝুমকি দেখল রুমকি ফোন করছে। বুঝেছিল চিঠিটা হয়তো রুমকিই প্রথম দেখেছে। ফোনটা কেটে মোবাইলটা অফ করে দিয়েছিল।

গলিতে হাঁটতে হাঁটতে ঝুমকি দেখল পাড়াটা খুব একটা পরিষ্কার না। সে নাক সিঁটকাল।

রিন্টু সেটা দেখল, বলল, "চিন্তা করিস না। খুব শিগগিরি আমরা শিয়ালদা সাইডে চলে যাব। খিদিরপুর আমারও পছন্দ না।"

ঝুমকির একটু ভয় ভয় করছিল। সে রিন্টুর হাত জোরে চেপে ধরল।

খানিকক্ষণ পরে তারা রিন্টুদের বাড়িতে পৌঁছল। রিন্টু দরজা ধাক্কাল। একজন মহিলা দরজা খুলল।

তাদের দেখে অবাক হয়ে তাকাল। রিন্টু বলল, "নিয়ে এসেছি।"

মহিলা দরজা ছেড়ে দাঁড়াল।

বাড়িটা বেশ বড়। গলির মধ্যে যে এত বড়ো বাড়ি হতে পারে ঝুমকির ধারণা ছিল না।

রিন্টু ঝুমকিকে একটা ঘরে বসিয়ে ফ্যান চালিয়ে দিয়ে বলল, "বস। মাকে নিয়ে আসি।"

ঝুমকি ঘরটা দেখল। বেশ বড়ো একটা খাট। দেওয়ালে একটা বড়ো ক্যালেন্ডার।

তার একটু অস্বস্তি হচ্ছিল। কেন হচ্ছিল সে নিজেও বুঝতে পারছিল না।

খানিকক্ষণ পরেই সালোয়ার পরা এক মধ্যবয়স্ক মহিলা ঘরে ঢুকলেন। ঝুমকি বুঝল ইনিই রিন্টুর মা।

সে উঠে প্রণাম করতে গেল। মহিলা তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "জিতি রহো।" রিন্টু ঘরে ঢুকেছিল। মহিলা ওকে বললেন, "খানা খাকে আয়া হ্যায়?"

রিন্টু বলল, "নেহি।"

মহিলা রাগি চোখে ছেলের দিকে তাকালেন। তারপর তার দিকে তাকিয়ে বললেন, "ঠহরো।"

ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন ভদ্রমহিলা।

ঝুমকি ভাবছিল কথাটা। শেষমেশ বলেই ফেলল, "তোমাদের বাড়িটা কেমন মুসলমান মুসলমান বাড়ি। এরকম মক্কা শরিফের ফটো দেওয়া ক্যালেন্ডার ঝুলিয়েছ কেন দেওয়ালে?"

রিন্টু খাটে বসে পা দোলাতে দোলাতে বলল, "মুসলমানদের বাড়ি মুসলমানদের মতোই তো হবে। কেমন আশা করছিস?"

ঝুমকি হাঁ করে রিন্টুর দিকে তাকাল। বলল, "মানে?"

রিন্টু বলল, "কেন তুই জানিস না?"

ঝুমকি মাথা নাড়ল দুদিকে। "না তো।"

রিন্টু বলল, "তাতে কি কোনও সমস্যা আছে তোর? আমি কিন্তু কোনও জোর করছি না। তুই চাইলে আমি তোকে বাড়ি দিয়ে আসতে পারি।"

ঝুমকি একটা চেয়ার টেনে বসল। তার ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না সবটা।

সে বলল, "আমাকে তো কোনও দিন বলোনি!"

রিন্টু বলল, "এটা কি খুব ইম্পরট্যান্ট কিছু ব্যাপার? জানতাম না তো!"

ঝুমকি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল এমন সময় রিন্টুর মা দুটো থালা নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। খাটের ওপর রেখে তার দিকে তাকিয়ে আধভাঙা বাংলা হিন্দি মিশিয়ে বললেন, খাওয়া হয়ে গেলে থালা দুটো ঘরের বাইরে রেখে দিতে।

রুটি মাংস দিয়ে গেছেন ভদ্রমহিলা। রিন্টু বলল, "খেয়ে নে। খেয়ে বাড়িতে ফোন কর। চিন্তা করবে সব।"

ঝুমকি বলল, "কীসের মাংস?"

রিন্টু বলল, "বিফ। খাস তো তুই। আসমাতে সেই মনে নেই?"

ঝুমকির খিদে পেয়েছিল। সে খাওয়া শুরু করল।

রিন্টুও খাচ্ছিল। বলল, "আজ রাতে ট্রেনে উঠব। হানিমুন সেরে আসি। তারপর দেখা যাবে। তোর বাড়ি থেকে কদিন আর ঝামেলা করবে। ঠিকই মেনে নেবে।"

ঝুমকি কিছু বলছিল না। চুপচাপ খেয়ে যাচ্ছিল।

তার হঠাৎ করে খুব কান্না পাচ্ছিল।

কেন পাচ্ছিল নিজেই বুঝতে পারছিল না।

৪

তড়িঘড়ি শ্বশুরবাড়ি পৌঁছে আদিত্য বুঝতে পারল সমস্যা গুরুতর। ড্রয়িং রুমে গম্ভীর মুখে শ্বশুর, শাশুড়ি আর রুমকি বসে আছে।

আদিত্য বলল, "কী হয়েছে? প্রবলেম কী হল?"

রুমকি ঝুমকির চিঠিটা আদিত্যকে দিল।

চিঠিতে লেখা, "আমি বিয়ে করছি মা। আমার সঙ্গে কোনও দিন আর যোগাযোগ রেখো না। জানি আমি খুব খারাপ।"

আদিত্য চিঠিটা পড়ে অবাক চোখে ঘরের সবার দিকে তাকাল। শ্বশুরমশাই তার দিকে তাকিয়ে বললেন, "কী করব?"

আদিত্য রুমকির দিকে তাকাল। রুমকি সম্ভবত কেঁদেছে। চোখ ফুলে গেছে। কাঁদলে ওর চোখ ফুলে যায়।

আদিত্য বলল, "ফোন করেছিল?"

রুমকি বলল, "ফোন অফ। তুমি তোমার ওই বন্ধুকে বলো না, যদি ট্র্যাক করা যায়।"

আদিত্য বলল, "দেখছি।"

আদিত্যর শ্বশুর তপনবাবু তার দিকে তাকিয়ে বললেন, "কার না কার সঙ্গে, কোন জাত, কী করে, কিছুই তো জানি না। রুমকিকে পর্যন্ত কাল অবধি কোনও হিন্টস দেয়নি।"

রুমকি বলল, "সব রেখে গেছে জানো তো, শুধু সার্টিফিকেটগুলো নিয়ে গেছে। ঝুমকির এত বুদ্ধি হতে পারে না।"

তপন বললেন, "আমি বিকাশকে আসতে বলেছি।"

আদিত্যর শাশুড়ি মিনু এতক্ষণ চুপ করে বসেছিলেন। মিনু কোনও দিনও বেশি কথা বলেন না। স্বামীর আলোতেই বরাবর আলোকিত। আদিত্যকে বললেন, "চা খাবে বাবা?"

আদিত্য বলল, "না না। এখন না।"

তপন রাগি গলায় বললেন, "ব্যানার্জি বংশের একটা সম্মান ছিল। কী মুখ দেখাব!"

রুমকি বলল, "আহ বাবা, আগে থেকে এত ভেবে রাখছ কেন, দ্যাখো না কী হয় আগে।"

তপন বললেন, "আর কী ভাবব, অজাত কুজাত, কোথাকার কোন মুচি মেথর জোটাবে কে জানে, আর..."

কলিং বেল বাজল। আদিত্য উঠল, "আমি দেখছি।"

আদিত্য দরজা খুলল। বিকাশ এসেছেন।

ঘরে ঢুকে সোফায় বসলেন। তপন বললেন, "কী করি বল আগে।"

বিকাশের গোঁফ দেখার মতো। বেশ মোটা গোঁফ। হরলিক্সের কাচের মতো মোটা কাচের ফ্রেমের চশমা। বিয়ের আগে অনেকবার আদিত্যর অফিসে আদিত্যর ঠিকুজি কুষ্ঠি জানতে গেছিলেন। তপনই পাঠাতেন। আদিত্যর বিকাশকে পোষায় না। শ্বশুরের বন্ধু বলে সহ্য করতে হয়।

বিকাশ বললেন, “গয়নাগাঁটি কিছু নেয়নি তো?”

তপন একটু আশান্বিত হলেন, “না। তা নেয়নি।”

বিকাশ বললেন, “লাভ জেহাদের নাম শুনেছিস?”

তপন গম্ভীর হলেন, “তা শুনিনি আবার। কান পাতলেই তো আজকাল শোনা যায়।”

বিকাশ একবার আদিত্য আর-একবার তপনের দিকে তাকিয়ে বললেন, “ধাঁচটা চেনা চেনা। আমার এক শালির মেয়েকেও এভাবেই...”

মিনু বিহ্বল চোখে রুমকির দিকে তাকালেন।

তপন বললেন, “তাহলে আজ থেকে আমার এক মেয়ে মরে গেছে জানতে হবে।”

বিকাশ বললেন, “ওদের ব্রাহ্মণ মেয়ে পছন্দ। টার্গেট করেই করে এগুলো। ভালোবাসা-টাসা সব ঢপের কেত্তন। কচি মেয়েদের মাথা খেতে কী লাগে? এদিক ওদিক বুঝিয়ে নিতে পারলেই হল।”

রুমকি রেগে গেল, "কী সব বলছেন উলটোপালটা কথা! আমাদের ঝুমকি কি সেরকম মেয়ে নাকি? একটা বলে দিতে পারলেই হল?"

বিকাশ রুমকির দিকে তাকালেন, "আমি কিছু বলছি না মা। পরিবেশ পরিস্থিতি বলছে। মেয়ের বাড়ির লোক কিছু জানতে পারছে না..."

আদিত্য বাধা দিল, "দেখুন এটা কোনও কথা না। কন্সপিরেসি থিওরি নিয়ে ভাবলে চলবে না আমাদের।"

তপন কঠিন চোখে আদিত্যর দিকে তাকালেন, "তা কী নিয়ে ভাবলে চলবে? মেয়েটার তো কোনও খোঁজ পাচ্ছি না!"

আদিত্য বলল, "ধর্ম বা জাতপাত নিয়ে এই সময়ে কি ভেবে সত্যিই কোনও লাভ আছে? আমার তো মনে হয় আমাদের ভয়টা অন্য দিকে হওয়া উচিত।"

তপন বললেন, "কোন দিকে?"

আদিত্য বলল, "নারী পাচার চক্র যেভাবে সক্রিয়..." আদিত্য একটু ইতস্তত করল।

বিকাশ হাত নাড়লেন, “ঝুমকি তো অশিক্ষিত নয়! একেবারে যে সে এই ধরনের চক্রের সঙ্গে জড়িয়ে যাবে, এসব নিয়ে আমি খুব একটা চিন্তিত নই।”

আদিত্য তপনের দিকে তাকাল, “দেখুন, আমার মনে হয় আমাদের একটা মিসিং ডায়েরি করা উচিত। লালবাজারে আমার এক বন্ধু আছে, আপনি বললে ফোন করতে পারি। শিক্ষিত অশিক্ষিত এসব সবসময়ে ভ্যালিড হয় না। কার মনে কী অভিসন্ধি থাকে তা প্রথম প্রথম সেভাবে বোঝা যায় না।”

তপন বিকাশের দিকে তাকালেন। সম্ভবত বিকাশ যা বলবেন তাতেই শিলমোহর দেওয়ার পরিকল্পনা তাঁর। বিকাশ বললেন, “কী বলবে তা তো জানি, প্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে নিজের অমতে বিয়ে করলে পুলিশের কিছু করার আছে বলে তো মনে হয় না। দ্যাখো ফোন করে।”

আদিত্য ফোনটা বের করল।

৫

সৈনিকদের তাঁবু খাটানো হয়েছে গঙ্গার পাশে।

প্রবল গ্রীষ্ম। সৈনিকরা এখানে তাঁবু খাটিয়ে কয়েক দিন থাকবে। দিনে প্রবল তাপপ্রবাহ থাকলেও রাতের দিকে গঙ্গার হাওয়ায় প্রাণ জুড়ায়।

সৈন্যদলের প্রধান আব্দাল খান বিমর্ষ মুখে বসে আছেন। দিল্লির হালচাল ভালো না। কামরান মির্জা (বাদশা হুমায়ুনের ভাই) তাঁকে তৈরি থাকতে বলেছেন। যে-কোনো সময় বাদশার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হতে পারে। কিন্তু আব্দাল খানের এখন যুদ্ধ করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই। ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ হবে আর তাঁদের মতো কিছু নিরীহ মানুষের প্রাণ যাবে, এই সারসত্য আব্দাল খান অনেক আগেই অনুধাবন করেছেন।

তাঁবু থাকলেও এখানে সৈনিকদের মনোরঞ্জনদের জন্য প্রায় প্রতি রাতেই সরাইখানা থেকে নর্তকী নিয়ে আসা হয়। সৈনিকদের মধ্যে মল্লযুদ্ধে যে জয়ী হয়, নর্তকীর সঙ্গে সে রাত কাটানোর সুযোগ পায়।

এভাবে সৈনিকদের মনোবল খানিকটা হলেও ধরে রাখার চেষ্টা চলছে। তবে আব্দাল খান বুঝতে পারছেন, ভেতরে ভেতরে মনোবল ভাঙছে। এভাবে দীর্ঘদিন প্রবাসে থাকা স্বাস্থ্যকর নয়। প্রায়ই বিদ্রোহ তৈরি হয়। আব্দাল খান অনেক কষ্টে সেগুলো দমন করেন।

বিকেলবেলা। আব্দাল খান অন্যমনস্ক ভাবে বিমর্ষ মুখে বসে ছিলেন, এমন সময় তাঁবুর বাইরে হইহই শব্দ শোনা গেল। আব্দাল খান শঙ্কিত হলেন। আবার কোনও বিদ্রোহের ইঙ্গিত দেখা দিল নাকি?

তড়িঘড়ি উঠে আব্দাল বাইরে গিয়ে দেখলেন চার-পাঁচজন সৈনিক একজনকে ঘিরে ধরে আছে। একটি কন্যা ভয়ার্ত চোখে চারদিকে তাকাচ্ছে।

আব্দাল এগিয়ে গিয়ে তাঁর সৈনিকদের জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছে? কে এ?"

সৈনিকরা জানাল এই লোকটি এই মেয়েটিকে নিয়ে যাচ্ছিল। তারা লোকটিকে আটকে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করায় লোকটা পালাতে যায়। তাকে ধরে সেনা ছাউনিতে নিয়ে আসা হয়েছে।

ধৃত সৈনিকের সঙ্গে আমাদের পূর্বে পরিচয় হয়েছে। এই সেই জলিল খান।

আর মেয়েটি রাধা।

আব্দাল তলোয়ার বের করে জলিল খানের গলায় ধরে বললেন, "কোথায় যাচ্ছিলে বাপু?"

জলিল খান মাথা নিচু করে বললেন, "জনাব, আমি বাদশায়ে হিন্দুস্থানের অধীনস্থ একজন সামান্য সৈনিক মাত্র। দিল্লি যাচ্ছিলাম। বাদশার জন্য ভেট নিয়ে।"

আব্দাল অবাক হয়ে বললেন, "ভেট? কোথায় ভেট?"

জলিল খান হাত দিয়ে রাধার দিকে ইঙ্গিত করলেন।

আব্দাল চিন্তিত হলেন। এইটুকু মেয়েকে বাদশার কাছে নিয়ে যাবে? যদিও বাদশাহি হারেমে যে এই বয়সি মেয়ে থাকে না তা নয়, তবে এত কমবয়সি মেয়ে? আব্দাল জলিল খানের দিকে তাকিয়ে ধমক দিয়ে বললেন, "মেয়েটিকে রেখে এখান থেকে বেরিয়ে যাও।"

জলিল খান তাঁর দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে বললেন, "আপনি বুঝতে পারছেন তো জনাব আপনি কী বলছেন? আপনি স্বয়ং বাদশাহর ভেটকে লুঠ করতে চাইছেন।"

আব্দাল সৈনিকদের দিকে তাকালেন। তাদের দিকে গলা তুলে বললেন, "তোমরা কী বলো, এই ছোট্ট মেয়েটাকে নিয়ে এই লোককে যেতে দেওয়া উচিত?"

সৈনিকদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল। কিন্তু কেউ কিছু বলল না।

জলিল খান বললেন, "আমাকে যেতে দিন জনাব বাদশাহের ভেট নিয়ে। নইলে এর ফলাফল ভালো হবে না।"

আব্দাল জলিলের দিকে তাকিয়ে বললেন, “আচ্ছা? এবার হুমকি দেওয়া হচ্ছে? তা তোমার এই চুরির কথা বাদশাহ জানেন? যদি তিনি রেগে গিয়ে উলটে তোমার গর্দান নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, তখন কী হবে?”

জলিল আব্দালের দিকে তাকিয়ে এবার রাগি গলায় বললেন, “আমায় যেতে দিন, আমি আবার বলছি...”

জলিলের কথা শেষ হল না, আব্দালের তলোয়ার বের করে জলিলের গলা বরাবর চালিয়ে দিলেন।

বিস্মিত জলিল কাটা কলাগাছের মতো মাটিতে পড়ে গেলেন।

রাধা এমনিতেই কাঁদছিল, এই ঘটনা চোখের সামনে দেখে আর্তনাদ করে কাঁদতে শুরু করল।

আব্দাল তলোয়ারটা ছুড়ে ফেলে রাধার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে মাথা নাড়াতে নাড়াতে বললেন, “ভয় নেই, ভয় নেই, আমি বাজে লোক নই।”

রাধা আব্দালের কথা বুঝল না, আব্দালের মুখে জলিলের রক্ত দেখে আরও কেঁদে উঠল।

আব্দাল শ্বাস ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে একজন সৈনিকের দিকে তাকিয়ে বললেন, "মেয়েটাকে আপাতত সরাইতে পাঠাও। এখানে তো রাখা সম্ভব নয়। পরে দেখা যাবে কী করা যায় এর সঙ্গে।"

৬

শেষ মুহূর্তে প্ল্যান চেঞ্জ হয়েছে। প্রথমে ঠিক হয়েছিল ট্রেনে যাওয়া হবে। কিন্তু রিন্টুর কী মনে হল, সে পাড়ার আসলামের থেকে গাড়ি বুক করল।

বাড়ি থেকে টিফিনকারিতে খাবার নেওয়া হয়েছে। রিন্টুর মা ঝুমকির জন্য বোরখা বের করে দিয়েছেন। সদ্য কেনা। সেটা পরার পরে ঝুমকির ভীষণ গরম লাগছিল।

রিন্টু ব্যাপারটা বুঝেছে। বলল, "একটু ম্যানেজ করে নে। কলকাতা পেরিয়ে গেলে বোরখাটা খুলে ফেলিস।"

ঝুমকি কোনও কথা বলেনি। চুপচাপ বসে ছিল।

ডানকুনি টোল পেরোলে প্রথম মুখ খুলল সে, "তোমার আসল নাম কী?"

রিন্টু বলল, "রুবেল খান। বাজে নাম, না?"

রিন্টু ঝুমকির হাতে হাত রাখল।

বাইরে ঝড়ের গতিতে গাড়িগুলো বেরিয়ে যাচ্ছে। ঝুমকি বলল, "তুমি কি আমাকে কনভার্ট করবে?"

রিন্টু জোরে হেসে উঠল, "ধুস, কেন কনভার্ট করতে যাব। তুই তোর মতো করে থাকবি। আর শোন, তোর কাছে এখনও সময় আছে। তুই যদি মনে করিস এই বিয়েটায় থাকবি না, আমি তোকে বাধা দেব না। বিলিভ মি, আমার মাথায় এই চিন্তাটা কোনও দিন আসেইনি।"

ঝুমকি বলল, "কোন চিন্তা? ধর্ম নিয়ে?"

রিন্টু বলল, "অবভিয়াসলি।"

ঝুমকি বলল, "আমার মাথাতেও আসেনি। কিন্তু প্রথমে বলোনি তার মানে তোমার সাবকনশাস মাইন্ডে কোথাও একটা ছিল যে তুমি মুসলমান জানলে আমি তোমাকে বিয়ে করব না, ঠিক না?"

রিন্টু ঝুমকির হাতে হালকা চাপ দিয়ে বলল, "তুই ডিসিশন নে। এখনও সময় আছে। বাড়ি যাবি?"

ঝুমকি বলল, “চিঠি দিয়ে এসেছি। এখন কোন মুখে বাড়ি যাব?”

রিন্টু বলল, “বলবি মজা করছিলি। বল, বাড়ি যাবি?”

ঝুমকি বলল, “না। আমার ফেরার আর কোনও পথ নেই।”

রিন্টু আর কিছু বলল না।

শক্তিগড়ে পৌঁছল গাড়ি। রিন্টু নেমে মুড়ি নিল।

ঝুমকি বলল, “কোথায় যাচ্ছি আমরা?”

রিন্টু ঝুমকির দিকে মুড়ির ঠোঙা এগিয়ে দিয়ে বলল, “চাচার বাড়ি আছে ধানবাদে। আজ রাতটা ওখানে থাকব। কাল ট্রেন ধরব ধানবাদ থেকে। তুই একটু ঘুমিয়ে নে পারলে।”

ঝুমকি ঠোঙা নিল না। বলল, “আমার খিদে নেই।”

রিন্টু বলল, “খেয়ে নে। রাগ করে থাকিস না।”

ঝুমকি বলল, "আমি রাগ করিনি। ডিস্টার্বড আছি একটু। তুমি এখন আমাকে ঘাঁটিয়ো না দয়া করে।"

রিন্টু বলল, "ঠিক আছে।"

ঝুমকির মাথা ধরেছিল। সে চোখ বন্ধ করে বসে থাকার চেষ্টা করল।

গভীর রাতে একটা বেশ বড়ো বাড়িতে তারা পৌঁছল। বাড়িভর্তি লোক গিজগিজ করছে। রিন্টু ঝুমকিকে নিয়ে নামতেই চারদিক থেকে লোক এসে তাদের ঘিরে ধরল।

রিন্টুর বড়ো চাচা দুহাজার টাকার নোট দিয়ে ঝুমকিকে আশীর্বাদ করল। ঝুমকির বোরখাতে গরম লাগছিল। রিন্টু বলেছিল চাচাদের সামনে বোরখা খোলা চলবে না। রাত দেড়টার সময় একটা ছোটো ঘরে তারা ঢুকল। রিন্টু দরজা বন্ধ করে বসল।

ঝুমকি পাশ ফিরে শুয়ে ছিল।

রিন্টু ঝুমকিকে ঠেলে বলল, "বোরখা খোল।"

ঝুমকি বলল, "থাক। ভালো লাগছে না।"

রিন্টু ঝুমকির ঘাড়ে চুমু খেল। ঝুমকি সিঁটিয়ে বলল, "প্লিজ, ছাড়ো আজকে।"

রিন্টু সরাসরি ঝুমকির বুকে হাত দিয়ে বলল, "ছাড়ার জন্য নিয়ে এসেছি তোকে? আজ আমাদের সুহাগ রাত। চল ওঠ।"

ঝুমকি চমকে উঠল। এই রিন্টুকে তো সে চেনে না। এই ছেলেটাকে তো সে ভালোবাসত না!

সে শক্ত হয়ে শুয়ে রইল।

রিন্টু সজোরে ঝুমকির পিঠে লাথি মারল। "ওঠ শালি, বিয়ে করেছি যখন, তখন কোনওরকম ন্যাকামি বরদাস্ত করব না।"

ঝুমকি ককিয়ে উঠল।

পরের আধঘণ্টা রিন্টু রীতিমতো ধর্ষণ করল ঝুমকিকে। শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঁচড়ের দাগ নিয়ে আধা অচেতন অবস্থায় ঝুমকি পড়ে রইল।

৭

"দেখুন, আপনার মেয়ে তো মাইনর নয়। যদি নিজের ইচ্ছায় গিয়ে থাকে, ইনফ্যাক্ট এই নোটটা তাই বলছে, সেক্ষেত্রে তো আমাদের কিছু করার নেই।"

সোফায় বসে ইন্সপেক্টর সুশোভন রায় বাড়ির সবার দিকে তাকিয়েই কথাগুলো বললেন। আদিত্যর দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুই বুঝতে পারছিস তো সমস্যাটা?"

আদিত্য মাথা নাড়ল।

বিকাশ তপনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কি রে, দেখলি? আমি কী বলেছিলাম?"

তপন সুশোভনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "দ্যাখো বাবা, তুমি আমার জামাইয়ের বন্ধু। তোমাকে তুমি করেই বলছি।"

সুশোভন মাথা নাড়লেন, "নিশ্চয়ই।"

তপন বললেন, "কিছুই কি করা যাবে না? মানে মেয়েটা কোথায় আছে, কী করছে, অন্তত সেটুকু তো জানা দরকার। পরে নাহয় কোনওভাবে বুঝিয়েসুঝিয়ে যদি..."

সুশোভন বললেন, "আপাতত ফোন ট্র্যাক করার চেষ্টা করছি। দেখা যাক কোনও লাভ হয় নাকি। আর যেভাবে শুধু সার্টিফিকেট নিয়ে গেছে তাতে মনে হচ্ছে আজকের দিনের

প্ল্যানটা আরও অনেক দিন আগে থেকেই করা হয়েছিল। আপনার মেয়ের ঘরটা একটু দেখব।”

সুশোভন উঠলেন। আদিত্যই নিয়ে গেল সুশোভনকে। পিছন পিছন রুমকি গেল।

সুশোভন ঘরের চারদিকে দেখল। বললেন, “ব্যাগ-ট্যাগগুলো?”

রুমকিই দেখাল ঝুমকির ব্যাগগুলো। বলল, “ব্যাগের শখ ছিল। গড়িয়াহাট থেকে কত যে ব্যাগ কিনেছে!”

সুশোভন বললেন, “ব্যাগগুলোতে যা আছে সব খাটের ওপর ফেলে দিন। আমি একটু দেখি যদি ছাই পাওয়া যায় কোনও।”

রুমকি ব্যাগগুলো খাটের ওপর খালি করে দিল।

সুশোভন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব দেখতে থাকলেন। বেশ কিছুক্ষণ পরে একটা গ্রিটিংস কার্ডের দিকে নজর গেল তাঁর। গ্রিটিংস কার্ডটা খুলে দেখলেন লেখা, “টু মাই লাভ, ফ্রম রিন্টু।”

সুশোভনের মুখে হাসি ফুটে উঠল। বললেন, “রিন্টু ছেলেটি কে?”

রুমকি বলল, "জানি না। মানে ঝুমকির সঙ্গে তো আমার সব ব্যাপারে কথা হত, কিন্তু ইদানীং আমাকে কিছুই বলত না।"

সুশোভন বললেন, "আপনার বোনের ক্লাসমেটদের নাম্বার দিতে পারবেন? কাল সকাল অবধি অপেক্ষা করতে চাইছি না আসলে। মেয়ে বাড়ি ছেড়ে কারও সঙ্গে গেছে বোঝা যাচ্ছে, এবার কোথায় গেছে, সেটা বের করা খুব একটা সমস্যা হবার কথা না।"

রুমকি বলল, "পাড়ার একটা মেয়ে আছে, সহেলি নাম। ঝুমকির কলেজে না পড়লেও ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল। ওকে জিজ্ঞেস করে দেখা যেতে পারে। সহেলি চিনতে পারে কলেজের কাউকে।"

রাত সাড়ে এগারোটার মধ্যে ঝুমকির কলেজের এক বন্ধুর থেকে রিন্টুর ব্যাপারে জানা গেল। কলেজে দেখা করতে আসত ছেলেটা । দেখে ভালো ফ্যামিলির বলে মনে হয়।

সুশোভন তপনকে বললেন, "যা বোঝা যাচ্ছে আপনার মেয়ে বিয়ে করেছে। কার সঙ্গে করেছে, কেমন পরিবার, কী বৃত্তান্ত, কালকের মধ্যে জেনে যাবেন।"

বিকাশ বললেন, "অন্য ধর্মে বিয়ে করলে কোনও স্টেপ নেওয়া যাবে না? ফুসলিয়ে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি?"

সুশোভন বিকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, "মেয়েটা স্বেচ্ছায় গেলে কিছুই করা যাবে না। তার লাইফ, তার সম্পূর্ণ অধিকার আছে নিজের মতো করে বাঁচার।"

বিকাশ বললেন, "শুনুন না অফিসার, আপনি বুঝতে পারছেন না, ব্রাহ্মণ বাড়ির মেয়ে, মুসলমান বিয়ে করলে কী হতে পারে বুঝতে পারছেন?"

সুশোভন আদিত্যর দিকে তাকালেন, "আমি এলাম রে। কাল তোকে সবটা দেখে বলব। ফোন ট্র্যাক করা যায় নাকি দেখছি।"

#

পরের দিন সকাল দশটা। আদিত্য রাতটা শ্বশুরবাড়িতেই ছিল। অফিস থেকে ছুটি নিয়েছে।

রুমকি মাকে সামলাচ্ছে। তপন গম্ভীর মুখে কাগজ পড়ছিলেন।

আদিত্যর ফোন এল, দেখল সুশোভন।

ধরল, "হ্যাঁ বল।"

"শোন, ছেলেটার নাম রুবেল খান। খিদিরপুরের ছেলে। কাল ওরা কলকাতা ছেড়েছে। এখন ধানবাদে আছে। আমরা যেটুকু করার করলাম। বুঝতেই পারছিস, বিয়েটা স্বেচ্ছায় হয়েছে। আমাদের হাত পা বাঁধা। সুতরাং..."

আদিত্য বলল, "বুঝেছি। থ্যাংক ইউ রে।"

ফোনটা রেখে আদিত্য রুমকিকে বলল, "একটু ও ঘরে চলো।"

তপনের চোখটা জ্বলে উঠল, "ও ঘরে যেতে হবে না। যা বোঝার আমি বুঝে গেছি। ও মেয়ে আমার কাছে আজ থেকে মৃত।"

রুমকির মা কেঁদে উঠলেন।

৮

আব্দাল খাঁর নির্দেশে পথের পাশের নিকটবর্তী একমাত্র বড়ো সরাইখানায় নিয়ে যাওয়া হল রাধাকে। সরাইখানা মানে শুধু খাওয়াদাওয়ার জায়গা নয়, এখানে নৃত্য এবং গীতে আগত পথযাত্রীদের মনোরঞ্জন করা হয়।

মূলত মুসলমান সৈনিক এবং সেনানায়করা এ সরাইখানায় বেশি আসেন। সন্ধের পর থেকে আশরফির আশকারায় গানবাজনায় এ চত্বর রমরমিয়ে চলে।

দ্বিপ্রহর। বাইজি মনোয়ারা নিজের কক্ষে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, এমন সময় একজন দাসী এসে উপস্থিত হল, "মা জি, জনাব আব্দাল খাঁ আপনার কাছে একটি পত্র পাঠিয়েছেন।"

মনোয়ারা বিরক্ত গলায় বললেন, "একটু বিশ্রাম করারও ফুরসত পাই না। কী পত্র পাঠিয়েছে, দে দেখি।"

দাসী ইতস্তত করে বলল, "আজ্ঞে, শুধু পত্র পাঠাননি, তার সঙ্গে একজনকে পাঠিয়েছেনও বটে।"

মনোয়ারা বললেন, "কাকে পাঠিয়েছেন?"

দাসী বাইরে থেকে রাধাকে নিয়ে ঘরে ঢুকল।

কেঁদে কেঁদে রাধার চোখ, নাক, মুখ ফুলে গেছে। মনোয়ারা অবাক চোখে দাসীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "এ কে?"

দাসী বলল, "পত্রে সব লেখা আছে সম্ভবত।"

মনোয়ারা বললেন, “পত্র আমি পড়তে পারি নাকি? আজমলকে ডেকে নিয়ে আয়। উফ, কী সব ঝামেলা যে কপালে এসে জোটে আল্লাই জানেন।”

দাসী ঘর থেকে তড়িঘড়ি বেরিয়ে গিয়ে একজন ষোড়শবর্ষীয় ছেলেকে নিয়ে এল। মনোয়ারা বললেন, “ও আজমল, কী লিখেছেন আব্দাল খান একটু পড়ে দাও তো শুনি।”

আজমল দাসীর হাত থেকে পত্রটা নিয়ে পড়ে রাধার দিকে তাকাল। রাধা তখনও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আজমল মনোয়ারার দিকে তাকিয়ে বলল, “আজ্ঞে এই মেয়েটিকে আশ্রয় দিতে বলেছেন। বলেছেন আপাতত আপনার কাছে রাখতে, উনি বাড়ি যাবার সময় নিজের মেয়ের খেলার সঙ্গিনী হিসেবে এই মেয়েটিকে নিয়ে যাবেন।”

মনোয়ারা রাগি চোখে দাসীর দিকে তাকিয়ে বললেন, “দেখেছিস? আমাদের কী ভাবে এরা? আমাদের কি কাজবাজ নেই?”

দাসী বলল, “অপরাধ মার্জনা করবেন মা জি, কিন্তু আব্দাল খাঁর কথা না শুনলে আমাদের এখানে শান্তিতে থাকা দুর্বিষহ হয়ে উঠবে।”

মনোয়ারার চোখ একটু জ্বলে শান্ত হয়ে গেল, "মেয়েটাকে নিয়ে যা। খেতে-টেতে দে। আর দেখিস, কেউ যেন মেয়েটার খবর না পায়, সেপাইদের এই কচি মেয়েদের প্রতিই ঝোঁক বেশি থাকে। ইবলিশের বাচ্চা যতসব।"

দাসী রাধার হাত ধরে বেরিয়ে গেল।

মনোয়ারা আজমলকে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন, বললেন, "খবর এসেছে কিছু?"

আজমল বলল, "হ্যাঁ, আজকেই।"

মনোয়ারা খুশি হলেন। মাথা নাড়িয়ে বললেন, "ব্যবস্থা করো।"

আজমল বেরিয়ে গেল।

#

রাত ঘনিয়েছে। আব্দাল খান তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে সরাইখানায় এসেছেন। বিশেষ মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা করা হয়েছে তাদের জন্য। সৈনিকদের মন পালাই পালাই করলে প্রায়ই এরকম জলসার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

সরাইখানার নাচঘরে প্রশস্ত পরিসরে তাদের বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মনোয়ারা বেগম স্বয়ং আজ নৃত্য পরিবেশন করবেন আব্দাল খানের সম্মানার্থে।

সুরা পরিবেশন হচ্ছে, তার সঙ্গে বিভিন্ন সুস্বাদু খাদ্যেরও আয়োজন হয়েছে।

তবলচিরা তবলায় বোল তুলছেন, খানিকক্ষণ পরেই মনোয়ারা বেগম প্রবেশ করবেন। একজন চতুর্দশবর্ষীয়া কন্যা এসে মাননীয় অতিথিদের হাতে বিভিন্ন সুগন্ধী ফুল দিয়ে গেল। আব্দাল খান উশখুশ করছেন। ঘরবাড়ি থেকে এত দূরে এসে শুধু নৃত্যগীতে মন ভরে না। মনোয়ারা বেগমের মতো একজন রাত্রিসঙ্গিনী পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তাঁর মনের মধ্যে চলাচল করছে।

এর আগে যেবার মনোয়ারা তাঁর সঙ্গিনী হয়েছিলেন, সে রাতের কথা ভাবতে আব্দাল উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। অধৈর্য গলায় বললেন, "বেগম এলেন?"

তবলার শব্দ ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল। নৃত্যকক্ষে প্রবেশ করলেন প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী মনোয়ারা বেগম। সুরার ঘোরে আব্দাল খান উত্তেজিত হয়ে উঠে বসলেন, কোমরবন্ধনী থেকে আশরফি ছুড়ে মারলেন মনোয়ারার উদ্দেশে। মনোয়ারা নৃত্য শুরু করলেন। মুহূর্তের মধ্যে তাঁর মোহময়ী নৃত্যকলায় নাচঘর যেন গভীর কোন ঘুম থেকে জেগে উঠল।

তবলার লয়ের সঙ্গে সঙ্গে মনোয়ারার শরীরী বিভঙ্গ দর্শকদের চিত্তচাঞ্চল্য ঘটাতে শুরু করল। আব্দাল খান সুরায় নিমজ্জিত হতে হতে মনোয়ারাকে পাওয়ার অভিপ্রায়ে অস্থির হয়ে উঠতে লাগলেন।

ঠিক এই সময় সবাইকে চমকে দিয়ে নাচঘরে প্রবেশ করল শের শাহ সুরির গোপন ঘাতক বাহিনী। আব্দাল খান প্রস্তুতির সামান্যতম সময়টুকু পেলেন না। মিনিট দশেকের মধ্যে প্রায় বিনা যুদ্ধে আবদাল খান এবং তার শাগরেদদের রক্তে ভেসে উঠল সরাইখানার নাচঘর।

প্রায় নিঃশব্দে এবং সুকৌশলে সেনাছাউনির দখল নিল শের শাহ সুরির সেনাবাহিনী।

আর এই সময় সরাইখানার পিছনের দরজা দিয়ে তার ঘোড়ায় করে রাধাকে নিয়ে আজমল পালিয়ে গেল।

৯

"অনার কিলিং বস্তুটাকে একটা সময় ঘেন্না করতাম। এখন বুঝি কোন পরিস্থিতিতে গিয়ে পরিবারের লোক এই সিদ্ধান্ত নেয়।"

গম্ভীর মুখে কথাটা বললেন তপন। আদিত্য চমকে শ্বশুরের দিকে তাকাল। খবরটা পাবার পর থেকে তপন গুম হয়ে গেছিলেন। এতক্ষণ পরে এই কথাটা বললেন। মিনু শাড়িতে মুখ চাপা দিয়ে কাঁদছিলেন।

তপনের কথা শুনে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

রুমকি প্রতিবাদ করে বলল, "কী বলছ বাবা এসব তুমি? মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোমার?"

তপন বললেন, "তো কী বলব? যাদের জন্য একটা দেশ থেকে উৎখাত হয়ে এপারে আসতে হল, তাদের গলাতেই যদি আমার মেয়ে মালা দেয়, তবে কি উদ্বাহু হয়ে নাচব? এত ইনভেস্টমেন্ট, এত আশায় সব জলাঞ্জলি দিয়ে... ছি ছি ছি..." মাথা নাড়লেন তপন।

রুমকি আদিত্যর দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি দ্যাখো না যদি ঝুমকির সঙ্গে ফোনে কথা বলানোর ব্যবস্থা করানো যায় তোমার ওই পুলিশ বন্ধুকে বলে!"

আদিত্য বলল, "দেখছি।"

দেখছি শব্দটা আদিত্য তার বসের থেকে শুনেছে। বস শিখিয়েছেন কখনও কোনও কিছুতে সরাসরি না বলতে নেই। বলতে হয় দেখছি। তাতে উলটোদিকের মানুষটা

কখনও রেগে যায় না। আবার কোনও কিছু না করেও পরে বলে দেওয়া যায়, চেষ্টা করেছিলাম, হল না।

তপন বললেন, “খিদিরপুরের মুসলমান, ভাবতে পারছিস?”

রুমকি বলল, “ভাবতে পারছি বাবা, কিন্তু তুমি আর এসব নিয়ে ভেবো না। ডাক্তার আঙ্কেলকে ফোন কর, তোমার প্রেশার মাপা দরকার।”

তপন জোরে জোরে মাথা নাড়লেন, “কাউকে ফোন করতে হবে না। আমি ঠিক আছি। পিনাকের ছেলে, পুনেতে ছিল যে, আমেরিকাতে আছে এখন, সব ঠিক করে রেখেছিলাম জানিস...”

তপনের গলা ধরে এল।

আদিত্য রুমকির দিকে তাকাল, “আমি অফিস যাই? ছুটিটা ক্যানসেল করা যাবে। ফিরে এসে নাহয়...”

রুমকি আগুনে চোখে আদিত্যর দিকে তাকিয়ে বলল, “একদিন না গেলে কিচ্ছু হবে না। বোসো চুপচাপ। আমি একা পারব সব সামলাতে?”

তপন বললেন, "না না, তুই আদিত্যকে আটকে রেখেছিস কেন? আমি আছি তো। কেসটা তো যা হবার হয়েই গেল। ও অফিসে গেলে যাক।"

আদিত্য রুমকির দিকে আর তাকাল না। উঠে পড়ল।

রুমকি বলল, "ফোনের ব্যাপারটা দেখো।"

আদিত্য বেরোতে বেরোতে বলল, "হুঁ।"

গাড়ি বের করে আদিত্য সন্তর্পণে প্রথম গিয়ারে দিয়ে গাড়িটা এগোল। নতুন গাড়ি চালানো শেখার মজা হল সারাদিন গাড়ি চালাতে ইচ্ছা হয়। আবার মুহূর্তের ভুলে বড়ো বিপদ ঘটে যেতে পারে।

খানিকটা গিয়ে রাস্তার বাঁদিকে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে সুশোভনকে ফোন করল আদিত্য। একটা রিঙেই ফোন তুললেন সুশোভন। বললেন, "বল রে।"

আদিত্য বলল, "বলছি ভাই, শ্বশুরবাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছি। অবস্থা খুব খারাপ। ছেলেটার বাড়ি নিয়ে যেতে পারবি আমায়? তুই আর আমি গেলাম? কোনও প্রবলেম আছে?"

সুশোভন বললেন, "প্রবলেম কিছু নেই, কিন্তু গিয়ে কী করবি?"

আদিত্য বলল, "জাস্ট দেখে আসব। আমার বউ তো পাগল করে দিচ্ছে বোনের সঙ্গে ফোনে কথা বলাতে হবে, যদি কিছু ব্যবস্থা করা যায় ওখানে গিয়ে।"

সুশোভন বললেন, "তুই কোথায় আছিস বল।"

আদিত্য নিজের লোকেশন বলল।

সুশোভন বললেন, "ঠিক আছে, তুই ওদিকে রওনা দে, আমিও যাচ্ছি। ফোন করে নিস আমায়।"

আদিত্য বলল, "ওকে।"

##

সরু গলিটায় ঢুকে নাকে রুমাল চাপা দিল আদিত্য। অত্যন্ত নোংরা গলিটা।

সুশোভন বললেন, "তুই বলেই এলাম। নইলে এসব কেসে পুলিশ কখনও আসে না। সেই কেসটা মনে আছে তো?"

আদিত্য বলল, “হ্যাঁ। তবে আমি তো কোনও ঝামেলা করতে আসিনি। জাস্ট কথা বলে চলে যাব।”

সুশোভন বাড়িটার সামনে দিয়ে দরজায় কড়া নাড়লেন। আশেপাশের বাড়ি থেকে পুলিশের উর্দিতে থাকা সুশোভনকে সবাই কৌতূহলী চোখে দেখছিল। দরজা খুলল কিছুক্ষণ পরে। এক মহিলা দরজা খুললেন। সুশোভন বললেন, “রুবেলের কেউ হন আপনি?”

ভদ্রমহিলা তাদের দুজনকে আপাদমস্তক মেপে বললেন, “আম্মি, ক্যা চাহিয়ে?”

সুশোভন বললেন, “বাড়ির ভেতরে গিয়ে কথা বলা যাবে? উনি মেয়েটির জামাইবাবু।”

ভদ্রমহিলা দরজা ছেড়ে দাঁড়ালেন।

১০

ঝুমকির শেষরাতের দিকে ঘুম এসেছিল। তলপেটে অসহ্য যন্ত্রণা। উঠে দেখল তার দিকে রিন্টু তাকিয়ে আছে। সে জাগতেই রিন্টু তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল, “কি রে, ঠিক আছিস?”

ঝুমকি অবাক হল। এই রিন্টু আর রাতের রিন্টু তো এক নয়! এই রিন্টুকেই তো সে এতদিন চিনে এসেছিল! রাতে কী হয়ে গেছিল ছেলেটার?

ঝুমকি উঠে বসতে গিয়ে ককিয়ে উঠল। ব্যথা করছে। রিন্টু ব্যস্ত হল, "কী হচ্ছে?"

ঝুমকি উত্তর দিল না।

রিন্টু ঝুমকির হাত ধরে বলল, "কি রে, এখনও রাগ করে আছিস? আসলে কাল রাতে আমার যে কী হয়েছিল, চাচাতো দাদা বউদিরা এমন সব কথা বলল, আমার মাথাটা কেমন হয়ে গেছিল।"

ঝুমকি বলল, "ওরা বললে তুমি আমাকে মেরেও ফেলতে, তাই না?"

রিন্টু ঝুমকিকে জড়িয়ে ধরতে গেল, "এসব কথা বলিস না প্লিজ। আমি সেটা করতে পারি? তুই তো মেরা জান সে ভি প্যারি।"

ঝুমকি নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, "বাথরুম যাব।"

রিন্টু বলল, "বুরখাটা পরে নে। বাইরে চাচা আছে।"

ঝুমকি অবাক হয়ে বলল, “মানে? বোরখা পরে বাথরুম যেতে হবে নাকি?”

রিন্টু বলল, “হ্যাঁ, এরা একটু গোঁড়া, বুঝলি না? আমাদের বাড়িতে অত চাপ নেই।”

ঝুমকি রেগে গেল, “তুমি তো কালকে বললে আমাকে এসব আর পরাবে না।”

রিন্টু বলল, “তুই যদি হিন্দু বিয়ে করতিস, শাঁখা সিঁদুর পরতিস না? এগুলো তো রিচুয়ালস। আমাদের রিলিজিয়নে মেয়েরা বেআব্রু থাক সেটা যদি আমাদের বয়স্ক লোকেরা না চায়, তবে কি তারা খুব ভুল কিছু চায়? সব ধর্মেরই তো আলাদা আলাদা রিচুয়ালস আছে। তুই-ই বল, আমি মুসলিম হয়ে কি খুব বড়ো কোনও অপরাধ করে ফেলেছি?”

ঝুমকি কয়েক সেকেন্ড রিন্টুর দিকে তাকিয়ে বোরখাটা পরে নিয়ে বলল, “দয়া করে বাথরুমটা দেখিয়ে দাও। আমি তো চিনব না, কার না কার ঘরে ঢুকে পড়ব, সেই নিয়ে আর-এক ঝামেলা শুরু হবে। আর এখান থেকে আজকেই যাব তো?”

রিন্টু ঝুমকির প্রশ্নটা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে উঠে বলল, “চল তোকে বাথরুমে নিয়ে যাই।”

ঝুমকি নড়ল না, বলল, “আজকে যাব তো এখান থেকে?”

রিন্টু মাথা চুলকে বলল, "ইয়ে মানে চাচা কাজি সাহেবকে খবর দিয়েছে। একটা ছোটো অনুষ্ঠান আছে। ওটা না করলে তো হবে না।"

ঝুমকি বলল, "কীসের ছোটো অনুষ্ঠান?"

রিন্টু বলল, "তোকে কনভার্ট করে তারপর নিকাহটা হবে। বেশিক্ষণের কাজ না। কাজি সাহেব এলেই হয়ে যাবে। ব্যাপারটা ফান বুঝলি? সিনেমায় দেখিস না, তিনবার কবুল বলে। করিনা কাপুরও তো বলেছিল।"

ঝুমকি বলল, "আমাকে কনভার্ট হতে হবে?"

রিন্টু কাঁধ ঝাঁকাল, "আরে জাস্ট একটা প্রোগ্রাম। এই আত্মীয়স্বজনদের মুখ বন্ধ করার জন্য। তুই তোর মতো তোর ধর্ম মেনে চলিস, আমি কিছু বলব না, সিরিয়াসলি।"

ঝুমকি বলল, "চলো বাথরুম দেখিয়ে দাও।"

ঘর থেকে বেরোনো মাত্র রিন্টুর চাচা চাচি বউদিরা ঝুমকিকে ঘিরে ধরল।

ঝুমকি ক্লান্ত মুখে রিন্টুর দিকে তাকাল। রিন্টু ওদের হাত থেকে ঝুমকিকে বাঁচিয়ে বাথরুমে নিয়ে গেল।

বাথরুমে ঢুকে সম্পূর্ণ নগ্ন হল ঝুমকি। নিজের দিকে তাকিয়ে কান্না পেয়ে গেল তার। বুকের ওপর একগাদা দাগ। এই ছেলেটাকে সে প্রেম করেছিল? জীবন দিয়ে ভালোবাসত? মানুষের এত তাড়াতাড়ি এত পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে?

বেশ খানিকক্ষণ বাথরুমে কাটিয়ে বেরোল ঝুমকি।

বাড়ির মাঝের খোলা জায়গাটায় রিন্টুর চাচা একটা চেয়ারে এসে বসেছে। আর-একজন অপরিচিত লোক ছাড়াও বাড়িভর্তি লোকজন।

ঝুমকি অবাক হয়ে রিন্টুর দিকে তাকাল।

রিন্টু বলল, "তোকে বললাম না?"

ঝুমকি কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থেকে বলল, "আমি একটু ঘর থেকে আসি?"

রিন্টু বলল, "ওকে।"

ঝুমকি বলল, "তুমি আসবে একটু?"

রিন্টু বলল, “আচ্ছা, আসছি।”

দুজনে ঘরে যেতে ঝুমকি দরজা বন্ধ করে বলল, “আমি কনভার্ট হতে চাই না। কিছু করা যাবে?”

রিন্টু ঝুমকির চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, “আমার বারোটা ভাই আছে। সবাই মিলে তোকে যদি রেপ করে কয়লাখনিতে ফেলে রেখে দেয়, তোর বাপ কেন, তোর চোদ্দোগুষ্টি খবর পাবে না, বুঝলি?”

ঝুমকি শিউরে উঠল। সেই অচেনা রিন্টু যাকে সে চেনে না! যাকে সে কোনও দিন ভালোবাসেনি!

রিন্টু গলা নামিয়ে বলল, “চুপচাপ বাইরে চ, যা যা করতে বলবে করবি। একটু নড়চড় হয়েছে কী তোকে আমি বুঝে নেব বলে দিলাম।”

১১

একটা ঘরে বসিয়ে রেখে ভদ্রমহিলা বেরোলেন। সুশোভন সিগারেট ধরিয়ে আদিত্যকে বললেন, “তোরা কেসটা নিয়ে এগিয়ে কোনও লাভ পাবি না সেটা বুঝতে পারছিস?”

আদিত্য দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, “না বোঝার কিছু নেই। অফিসটা গেল মাঝখান থেকে। কাউন্টার দিস।”

সুশোভন কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, ঘরের মধ্যে প্রায় দশ-বারোজন ছেলে এসে ঢুকল। তাদের পিছনে রিন্টুর মা। সুশোভন অবাক হয়ে বললেন, “কী ব্যাপার?”

রিন্টুর মা বললেন, “ইয়ে সব মেরে রুবেল কে ভাই হ্যায়। আপ ইন হি লোগো সে বাত কিজিয়ে।”

আদিত্য দেখল প্রায় সবাই ষণ্ডা গুন্ডা টাইপ। সে অবাক হয়ে সুশোভনের দিকে তাকাল। সুশোভন একটুও উত্তেজিত হলেন না। রিন্টুর মার দিকে তাকিয়ে বললেন, “আমরা তো বিয়েটা আটকাতে আসিনি। আপনি খামোখা ওদের ডেকে নিয়ে এলেন কেন?”

একটা ছেলে আদিত্যর দিকে তাকিয়ে বলল, “পুলিশ কিঁউ লেকে আয়া?”

আদিত্য বলতে যাচ্ছিল, সুশোভন আটকালেন তাকে। বললেন, “পুলিশ না। আমি ওর বন্ধু। যে মেয়েটি পালিয়েছে, ও আমারও বোনের মতোই। আমরা দেখতে এসেছি কোন বাড়িতে এসে ও উঠেছে। আপনাদের বাড়ির কোনও মেয়ে পালিয়ে বিয়ে করলে আপনাদের জানতে ইচ্ছা করবে না সে কেমন আছে, কোথায় আছে?”

সুশোভনের কথায় ভিড়ের উত্তেজিত ভাবটা কমল খানিকটা। রিন্টুর মা বসলেন। সুশোভন বললেন, “দেখুন মেয়েটি পালিয়ে বিয়ে করেছে, কিন্তু নিজের অমতে। আমাদের এখানে কিছু করার নেই। বুঝতে পারছেন আমি কী বলছি?”

রিন্টুর মা বাকি ছেলেদের দিকে তাকিয়ে সুশোভনের দিকে তাকিয়ে বললেন, “হাঁ বতাইয়ে।”

সুশোভন বললেন, “মেয়েটি, মানে যাকে আপনাদের ছেলে বিয়ে করেছে, তার মা খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝেই অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় ওরা কোথায় আছে, সেটা বললে, কিংবা যদি ফোনেও কথা বলানো যায়...”

একটা ছেলে বলে উঠল, “ফোন নেহি হ্যায় উসকে পাস।”

সুশোভন ঠান্ডা চোখে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে বললেন, “কিছু তো আছে, কন্ট্যাক্ট করার চেষ্টা করছি আমরা। ফোন অফ করে রেখে দিয়েছে। বাড়ির লোক না জানলে সমস্যা কি কমবে? আমরা তো বিয়েটা মেনে নিয়েছি।”

আদিত্য ছেলেগুলোর দিকে তাকাচ্ছিল। কারও চেহারাই স্বাভাবিক নয়। সুশোভনের ঠান্ডা মাথার মনে মনে তারিফ করল সে।

রিন্টুর মা বললেন ওরা দিল্লি গেছে। ফিরলে যোগাযোগ করতে বলবেন।

সুশোভন কয়েক সেকেন্ড বসে উঠে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে কার্ড বের করে রিন্টুর মার হাতে দিয়ে বললেন, "ঠিক আছে, কোনওরকম খবর এলে জানাবেন। আপনাদের যেমন পরিবার আছে, ওদেরও তেমনি আছে। বুঝতেই পারছেন, জন্ম থেকে বড়ো করার পরে মেয়ে যদি কিছু না বলে চলে যায়, তাহলে বাবা মার ওপর দিয়ে ঠিক কতটা চাপ আসতে পারে।"

রিন্টুর মা কিছু বললেন না। সুশোভন আদিত্যকে বললেন, "চল।"

আদিত্য সুশোভনের পিছন পিছন এগোল। ছেলেগুলোও তাদের সঙ্গে সঙ্গে গেট অবধি এল। গলি দিয়ে হেঁটে বড়ো রাস্তায় উঠে হাঁফ ছাড়ল আদিত্য। বলল, "বাপ রে, কী ডেঞ্জার জায়গা রে!"

সুশোভন বললেন, "সেন্সিটিভ জায়গা। খুব সাবধানে হ্যান্ডেল করতে হয়। না হলেই চিত্তির। অনেকরকম খেলা চলে এখানে।"

আদিত্য বলল, "সেটা বুঝতেই পারছি। তোর সেই মাথা গরম অবতার এতটা চেঞ্জ হয়ে গিয়ে প্রায় অপোজিট হয়ে গেছে সেটা দেখেও অবাক হয়ে গেলাম। ফাটিয়ে দিলি তো!"

সুশোভন বললেন, “কিছু করার নেই। যেখানে যেরকম, সেখানে তেমন হতেই হবে। এখানে আমি একা কী করব? তুই-ই বা কী করতিস? কীভাবে তেড়ে এসেছিল দেখেছিস?”

আদিত্য চিন্তিত গলায় বলল, “হুঁ। কেসটা আর কিছু করার নেই।”

সুশোভন বললেন, “এক-একটা ফ্যামিলি এক-এক রকম ভাবে ডিল করে। কিছুদিন আগে এক মাড়োয়ারি ফ্যামিলির মেয়ে একটা মুসলিম ছেলের সাথে ভেগেছিল। ছেলের বাপ বুঝিয়ে-টুঝিয়ে মেয়েটাকে বাড়িতে এনে আর-একটা বিয়ে দিয়ে দিল অ্যাব্রডে। সে ক্যাচাল এখনও আমাদের সামলাতে হচ্ছে। তবে তোর শ্বশুরকে বলে দে ব্যাপারটা নিয়ে আর কিছু না করতে।”

আদিত্য বলল, “উনি কিছু করবেনও না আর। এমনিতেই তীব্র অ্যান্টি-মুসলিম। আর-এক বন্ধু আছে। লাভ জিহাদ এটসেট্রা বুঝিয়ে দিয়েছে। আর কী...”

সুশোভন বললেন, “বাদ দে। আমি তবে যাই রে, আর বেশিক্ষণ থাকলে চলবে না। একগাদা কাজ জমে আছে।”

আদিত্য ঘাড় নাড়ল, “ঠিক আছে। দেখি কী করা যায়।”

সুশোভন চলে গেলেন।

আদিত্য কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে আবার রিন্টুদের বাড়ির দিকে রওনা দিল।

১২

আদিত্য শ্বশুরবাড়ি পৌঁছল বেলা চারটে নাগাদ। রুমকি দরজা খুলল।

তাকে দেখে উদ্বিগ্ন গলায় বলল, “কী হল? কোনও আপডেট পেলে?”

আদিত্য দেখল ড্রয়িং রুমে শ্বশুর শাশুড়ি দুজনেই বসে আছেন।

সে রুমকির দিকে তাকিয়ে বলল, “হ্যাঁ, ওই ছেলেটার বাড়ি গেছিলাম সুশোভনের সঙ্গে।”

শাশুড়ি উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, “বসো বাবা, বসো। এই দুপুর রোদে এলে।”

আদিত্য সোফায় বসে বলল, “হ্যাঁ, বিয়েটা হয়ে গেছে। এখন আর কিছু করার নেই আর কি।”

তপন শ্লেষ জড়ানো গলায় বললেন, "তাহলে তো হয়েই গেল। তা উনি কি এখন এখানেই আছেন?"

আদিত্য রুমকির দিকে তাকিয়ে বলল, "না, হানিমুনে গেছে।"

শাশুড়ি অন্য ঘরে চলে গেলেন।

রুমকি বলল, "তোমার বন্ধু কী বলল? কিছু করা যাবে?"

আদিত্য বলল, "ওরা ভীষণ অ্যাগ্রেসিভ। আর কিছু করা যাবে বলে মনে হচ্ছে না।"

তপন রুমকির দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমি জানতাম। ওরা এমনই। সঙ্গে সঙ্গে কনভার্ট করে দেয়। যেভাবে সোনার দোকানে সোনা বেচার পর ওরা সোনা গলিয়ে দেয়, একইভাবে কোনও হিন্দু মেয়ে যদি ওরা বিয়ে করে, ওদের টার্গেটই থাকে কত তাড়াতাড়ি কনভার্ট করবে।"

আদিত্য বলল, "তা কেন হবে? অনেক ক্ষেত্রেই সেটা হয় না। আমাদের অফিসের এক কাপলই আছে, মহিলাটি এখনও শাঁখা সিঁদুর পরেন।"

তপন তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করে বললেন, “হবে হয়তো। যাই হোক, আমি আর চিন্তা করছি না। প্রথম প্রথম আমার টেনশন হচ্ছিল। এখন আমি অধিক শোকে পাথর হয়ে গেছি। অবশ্য শোক করবই বা কার জন্য? যে মেয়ে নিজের পরিবারের মূল্যবোধের দাম দিতে পারে না, তাকে তো আর কিছু বলার নেই আমার।”

আদিত্যর অস্বস্তি হল, এমনিতেই শ্বশুরের সামনে সে খুব একটা স্বাভাবিক হতে পারে না, তার ওপর এই পরিস্থিতি। সে রুমকির দিকে তাকিয়ে বলল, “আমরা তাহলে কি আজ বাড়ি যাব?”

রুমকি একবার বাবার দিকে, আর-একবার আদিত্যর দিকে তাকিয়ে বলল, “আমি তো এই অবস্থায় কোনওভাবেই যেতে পারব না। তুমি যাও বরং। আমি দুটো দিন বাবা-মার কাছে থেকে যাই। এখনই যেয়ো না, লাঞ্চ করোনি তো?”

আদিত্য বানিয়ে বলল, “হ্যাঁ, করে এসেছি। সুশোভন খাইয়ে দিয়েছে। আমি যাই বরং।”

রুমকি আদিত্যর অস্বস্তিটা বুঝল। বলল, “ঠিক আছে, তুমি সাবধানে যেয়ো। গিয়ে ফোন কোরো কিন্তু।”

তপন বিড়বিড় করে বললেন, “সবাই এবার আমাকে দেখে হাসবে। সারাজীবন ভক্তিভরে ধর্মপালন করে গেলাম, আর সেই আমার মেয়েকেই কিনা... ছি ছি ছি।”

আদিত্য ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে গেল। পিছন পিছন রুমকি।

আদিত্য জুতো পরছিল, রুমকি ফিসফিস করে বলল, "কী বুঝলে? কেমন বাড়িঘর?"

আদিত্য বলল, "একেবারেই অন্য ধরনের, ওই পরিবেশে থাকতে পারবে না। সব কিছুই অন্যরকম। কী দেখে গেল, ও-ই জানে।"

রুমকি কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, "চিরকালই তো বোকা হাঁদা একটা জানোই তো, কোনও কিছুর আগু পিছু কিছু না ভেবে কাজ করে ফ্যালে। ও যে এরকম করবে তা তো জানা ছিলই। এবার কী হবে?"

আদিত্য বলল, "মেনে নিতে হবে। সময় পালটেছে, এখনও যদি প্রাচীন ধ্যানধারণা নিয়ে থাকতে হয় সেটা তো অসম্ভব, তাই না?"

রুমকি রেগে বলল, "আমার বোন বলে খুব সহজে কথাটা বলে দিতে পারলে, তাই না? নিজের বোন হলে বলতে পারতে?"

আদিত্য থমকে দাঁড়িয়ে বলল, "আমি কী করব বলো? আমার কী করার আছে? আমি তো ছেলেটার সঙ্গে তোমার বোনের পরিচয় করিয়ে দিইনি, দিয়েছি কি?"

রুমকি চাপা গলায় বলল, “একদম গলা তুলে কথা বলবে না। ভদ্রভাবে কথা বলো। এমনিতেই আমার বাবা মা চিন্তায় আছে।”

আদিত্য বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, “সেজন্যই তো আমি থাকছি না। তুমি থেকে সামলাও।”

রুমকি রাগি মুখে দাঁড়িয়ে রইল। আর বাড়ির বাইরে গেল না।

#

রাত সাড়ে নটা।

আদিত্য ফ্ল্যাটে ফিরে টিভি দেখছিল। হোম ডেলিভারি থেকে খাবার আনিয়েছে। আর কিছুক্ষণ পর খেতে বসবে। রুমকিকে আর ফোন করেনি।

আর-এক দফা ঠান্ডা লড়াই শুরু হয়েছে রুমকির সঙ্গে। এরকম তাদের প্রায়ই হয়। যখন হয়, তখন দু পক্ষের কথা বন্ধ থাকে। কোনও প্রয়োজন ছাড়া কথা শুরুও হয় না।

সোফায় বসে আদিত্যর ঘুমে চোখ লেগে আসছিল। সারাদিন অনেক পরিশ্রম গেছে।

সে ভাবছিল ডিনারটা কাটিয়েই দেবে, এমন সময় কলিং বেল বেজে উঠল।

আদিত্য বিরক্ত মুখে উঠল, দরজা খুলে অবাক হয়ে গেল।

বাইরে ঝুমকি দাঁড়িয়ে আছে। রীতিমতো হাঁফাচ্ছে।

১৩ ।।আগের কথা।।

ফিরোজা বেগম পথের পানে তাকিয়ে বসেছিলেন। ছেলেটা সেই কবে পালিয়ে চলে গেল মনোয়ারা বেগমের দলের সঙ্গে, তারপর থেকে কোনওরকম খোঁজ খবর নেই।

একা একা কাঁদেন, গ্রামের বাকি লোকেদের জিজ্ঞেস করেন। সবাই একটাই কথা বলে, ও ছোঁড়া কম বয়সে রং বুঝে ফেলেছে, আর ফিরবে না। ফিরোজা তাঁর জীর্ণ কুটিরে দিন গুজরান করতে করতে স্বামী সন্তানের কথাই ভাবেন। আজমলের বাবা ইব্রাহিম লোদির সেনাবাহিনীর সেপাই ছিলেন। যুদ্ধে মারা যান। তখন সবে আজমল হয়েছে। তারপর থেকে কম কষ্ট হয়নি ফিরোজার। আগামী দিনের কথা ভেবে দাঁতে দাঁত চেপে ছেলেকে বড়ো করে তুলেছিলেন শেষ সঞ্চয়টুকু দিয়ে। সে ছেলেটাকে পর্যন্ত মনোয়ারা বশ করে নিয়ে চলে গেল।

দুপুর হয়েছে, ফিরোজা সামান্য কিছু মুখে দিয়ে বসে ছিলেন, হঠাৎ দূর থেকে একটা ঘোড়া আসতে দেখে সোজা হয়ে বসলেন। এ ভঙ্গি তো তাঁর বড়ো চেনা। ফিরোজা উঠে দাঁড়ালেন, দৌড়োতে দৌড়োতে দুপুর রোদের মধ্যেই ধুলোমাখা পথে গিয়ে দাঁড়ালেন।

আজমল! আজমল এসেছে। সঙ্গে একটা মেয়ে!

আজমল একদম তার বাবার মতো ঘোড়া থেকে নামল। ঘোড়া থেকে মেয়েটাকে নামাল। পরক্ষণেই ছুটে এসে মাকে জড়িয়ে ধরল, "আম্মিইই... কেমন আছ তুমি?"

ফিরোজা কাঁদতে কাঁদতে ছেলের দুগালে জোরে জোরে চড় মারতে বললেন, "কোথায় চলে গেছিলি তুই আমাকে না বলে? ওই ডাইনিটা তোকে কি গুণ করেছিল? আর এই মেয়েটা কে?"

রাধা ফিরোজা আর আজমলের ভাষা কিছুই বুঝতে পারছিল না। পথশ্রমে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ করে মাথা ঘুরে পড়ে গেল।

ফিরোজা দৌড়ে গিয়ে রাধাকে ধরে আজমলকে ধমক দিয়ে বললেন, "পানি নিয়ে আয়। তাড়াতাড়ি যা।"

আজমল দৌড়ে জল নিয়ে এল। ফিরোজা রাধার চোখে মুখে জল ছিটিয়ে দিলেন। আজমলকে বললেন, “ওকে ঘরে নিয়ে চল।”

মা ছেলে মিলে রাধাকে ধরে ঘরে নিয়ে মেঝেতে শোয়াল।

ফিরোজা আরও অনেকটা জল দিলেন রাধাকে। রাধা ক্লান্ত চোখে ফিরোজার দিকে তাকাল।

ফিরোজা রাধার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে আজমলের দিকে তাকিয়ে রাগি গলায় বললেন, “দেখে হিন্দু মনে হচ্ছে। কোত্থেকে নিয়ে এসেছিস তুই ওকে?”

আজমল বেড়ায় হেলান দিয়ে বসে বলল, “বেগমের কুঠি থেকে। ওকে হারেমে পাঠিয়ে দিত নইলে।”

ফিরোজা বললেন, “দিলে দিত। তোর কী হয়েছিল?”

আজমল মাথা চুলকে বলল, “জানি না, কী হয়েছিল। মনে হল ওকে হারেমে নিয়ে গেলে খুব খারাপ হবে। তাই যখন সরাইখানায় ঝামেলা শুরু হয়ে গেল, আমি ওকে উঠিয়ে নিয়ে চলে এলাম। আগে পিছে কী হবে, অত ভেবে দেখিনি আমি।”

ফিরোজা ছেলের দিকে তাকালেন। ছেলেটা এ কদিনেই কতটা বড়ো হয়ে গেছে। কেমন বড়োদের মতো করে কথা বলছে। মেয়েটার মধ্যেও একটা অদ্ভুত মায়া আছে। ফিরোজা প্রাণভরে মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে আজমলকে বললেন, "এ মেয়েকে তো এমনি এমনি এখানে রাখা যাবে না। ইমাম সাহেব অনেকরকম প্রশ্ন করবেন। গ্রামের বাকি মুরুব্বিরাও ছেড়ে কথা বলবেন না। তোকে এ মেয়েকে বিয়ে করতে হবে।"

আজমল লজ্জায় মাথা নিচু করল।

ফিরোজা আজমলের চুলের মুঠি ধরে নাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "সেই ইচ্ছাই ছিল তোর, তাই না?"

আজমল বলল, "জানি না আম্মি, অত কিছু তো ভাবিনি আমি।"

ফিরোজা বললেন, "কোথায় বাড়ি এ মেয়ের? জানিস কিছু?"

আজমল মাথা নাড়ল।

ফিরোজা আরও খানিকটা জল রাধার চোখে মুখে দিলেন। রাধা কেঁদে উঠল, "আমি বাবার কাছে যাব।"

ফিরোজা অবাক মুখে আজমলের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এটা কী ভাষা?"

আজমল বলল, "পুবের ভাষা। বঙ্গাল মুলুকের ভাষা মনে হয়।"

ফিরোজা বললেন, "এই মেয়েকে তুই বিয়ে করলে কী করে হবে? কেউই তো কিছু বুঝব না ও কী বলছে। কিন্তু এভাবে রেখেও তো দেওয়া যাবে না। ঠিক আছে, কাজি সাহেবকে ডেকে আজকেই বিয়ে পড়িয়ে দিচ্ছি। তারপর আমি দেখছি কী করা যায়।"

আজমল বলল, "আর মনোয়ারা বেগম যদি ওকে খুঁজতে এখানে চলে আসে?"

ফিরোজা চিন্তিত গলায় বললেন, "তা তো হতেই পারে। ওদের অনেক ক্ষমতা। সত্যিই যদি দেখতে পায় ওর দলের মেয়ে নিয়ে এসেছিস, তাহলে সবাইকে মেরে ফেলবে। কী করা যায়?"

আজমল বলল, "দিল্লি চলো মা। ছোটো খালার কাছে যাই। এখানে, এই গ্রামে থেকে তো কিছু হবেও না। আমাদের চাষের জমিই বা কতটুকু আর আছে? চলো দিল্লি যাই।"

ফিরোজা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "এতদিন পরে এলি, তাও আবার কতরকম মুসিবত নিয়ে এলি। তুই কোনও দিন আর মানুষ হলি না রে আজমল, এত বড়ো হয়ে গেলি, তবুও মানুষ হলি না।"

১৪ ।। এই সময়।।

আদিত্য অবাক চোখে ঝুমকির দিকে তাকিয়ে বলল, "তুই? এত রাতে?"

ঝুমকি হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, "দিদি কোথায়?"

আদিত্য বলল, "রুমকি তো তোদের বাড়িতেই। বাবা মাকে সামলাচ্ছে। আয়, ভিতরে আয়।"

ঝুমকি তাড়াতাড়ি ফ্ল্যাটের ভিতরে ঢুকে বলল, "দরজাটা দাও শিগগিরি। ওরা আমাকে ফলো করছে নাকি জানি না।"

আদিত্য দরজায় লক করে বলল, "তুই বস। কী হয়েছে বল আগে।"

ঝুমকি কেঁদে ফেলল। আদিত্য কিছু বলল না। চুপ করে বসে থাকল। বেশ কিছুক্ষণ কাঁদার পর ঝুমকি বলল, "আমি কোনওমতে পালিয়ে এসেছি।"

আদিত্য বলল, "আমি তোর দিদিকে ফোন করব?"

ঝুমকি জোরে জোরে মাথা নাড়ল, "না, দিদিকে ফোন কোরো না। বাবা মাকে যদি বলে দেয় আর-এক ঝামেলা। দিদির পেটে কোনও কথা থাকে না।"

আদিত্য রুমকিকে খুব ভালো করে চেনে। ঝুমকি কথাটা ঠিকই বলেছে।

সে বলল, "কী হয়েছিল কী? হঠাৎ করে এত বড়ো কাণ্ড করার দরকার কী ছিল?"

ঝুমকি আবার কেঁদে ফেলল। কাঁদতে কাঁদতে জানাল কলেজ ফেস্টের দিন রিন্টুর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। দারুণ গিটার বাজায়, ব্যান্ডে গান করে। কখন যে দুজনের প্রেম হয়ে গেল বুঝতেও পারেনি। বিয়ের সমস্ত প্ল্যানিং ও-ই করেছিল। শুধু সার্টিফিকেট নিয়ে আসা, মোবাইল অফ করে রাখা, সব প্ল্যান রিন্টুর। ও যে অন্য ধর্মের, কোথায় থাকে, সে সম্পর্কে আগে কিছুই জানায়নি তাকে। ঝুমকিও জানার প্রয়োজন বোধ করেনি কখনোই। কিন্তু একদিনের অভিজ্ঞতা তার রিন্টু সম্পর্কে সমস্ত ধারণাই পরিবর্তন করে দিয়েছে। বাকি সবটা বলার পর ঝুমকি জানাল কী করে সে পালাতে পারল।

ঝুমকিকে কনভার্ট করার উৎসবে একে একে জড়ো হয়েছিল সবাই। স্থানীয় ইমামও চলে এসেছিলেন। হঠাৎ রিন্টুর চাচি রিন্টুকে বলল, বহুকে তারা সাজাতে চায়। রিন্টু আর আপত্তি করেনি। ঝুমকিকে নিয়ে চাচি একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে তাকে চমকে দিয়ে বাংলায় বলল, "তোমাকে জোর করে নিয়ে এসেছে, না?"

ঝুমকি হাঁ করে রিন্টুর চাচির দিকে তাকাল।

রিন্টুর চাচি বলল, "আমি সব বুঝেছি। আমাকেও একদিন এভাবেই নিয়ে আসা হয়েছিল। তুমি যাও, পিছনের দরজায় আমার খুব বিশ্বস্ত একজন গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তুমি গাড়িতে গিয়ে ওঠো। ও তোমাকে স্টেশনে দিয়ে আসবে, আর এই টাকাগুলো রাখো। কোনও দিন ভুলেও এর কাছে ফিরে আসবে না, মনে রেখো, জানে মেরে দেবে তোমাকে।"

হাতে বেশ কিছু টাকা দিয়ে রিন্টুর চাচি ঝুমকিকে বাড়ির পিছনের দরজা দিয়ে বের করে দিল। সেখান থেকে স্টেশন, হাওড়াগামী ট্রেন, হাওড়া থেকে এখানে ট্যাক্সি নিয়ে আসা, সমস্ত পথটাই ঝুমকি তীব্র আতঙ্কের মধ্যে ছিল। তার বারবার মনে হয়েছে, এই বুঝি রিন্টু তাকে ধরে ফেলল।

আদিত্য ফ্রিজ থেকে জলের বোতল এনে ঝুমকিকে দিয়ে বলল, "জল খা। এসে যখন পড়েছিস, তখন আর চিন্তার কিছু নেই।"

ঝুমকি আদিত্যর দিকে তাকিয়ে বলল, "বাবা সব জেনে গেছে, না?"

আদিত্য কয়েক সেকেন্ড থমকে বলল, "হ্যাঁ। সবটাই।"

ঝুমকি মাথা নিচু করে বলল, “বাবা আমাকে কোনও দিন মেনে নেবে না।”

আদিত্য বলল, “সেটা বড়ো কথা না। তুই বেরিয়ে আসতে পেরেছিস, সেটা বড়ো কথা। জলটা খা। আমি সুশোভনকে ফোন করি।”

ঝুমকি বলল, “সুশোভন কে?”

আদিত্য বলল, “আমার বন্ধু। পুলিশে আছে। চিন্তা করিস না। তুই খাসনি তো কিছু? ফ্রিজে খাবার আছে, গরম করে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়।”

ঝুমকি উঠল না। বসে রইল।

আদিত্য একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুশোভনকে ফোন করল।

সুশোভন একটা রিং হতেই ধরলেন, “বল রে, কোনও আপডেট?”

আদিত্য বলল, “ঝুমকি ফিরে এসেছে। টর্চার হয়েছে, কনভার্শনের চেষ্টা হয়েছে এবং রেপ হয়েছে। কী করা যায়?”

আদিত্যর কথা শুনে ঝুমকি মুখ চাপা দিল দু হাত দিয়ে।

সুশোভন চাপা গলায় বললেন, “ফিরে আসতে পেরেছে এটা বিরাট ব্যাপার। বাকিটা কী হবে সেটা নিয়ে কাল কথা বলি বরং। মেয়েটি কোথায়?”

আদিত্য বলল, “আমার সামনেই। এখন কথা বলতে পারবে না। বুঝতেই পারছিস কী অবস্থা ওর।”

সুশোভন বললেন, “ওকে। কাল কথা হচ্ছে। গুড নাইট।”

আদিত্য বলল, “গুড নাইট।”

ফোনটা রেখে আদিত্য ঝুমকিকে বলল, “তুই খেয়ে নে।”

ঝুমকি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলল, “আমি নষ্ট হয়ে গেলাম।”

আদিত্য চুপ করে বসে রইল।

১৫

ঝুমকি গেস্টরুমে ঘুমাল। আদিত্য বেশ কয়েকবার ভেবেছিল রুমকিকে জানাবে, কিন্তু শেষ মুহূর্তে আর জানাল না। ঝুমকি ঠিকই বলেছে রুমকির সম্পর্কে। ও পেটে কথা

রাখতে পারে না। এখন ওদের বাবার প্রতিক্রিয়া ঠিক কী হবে সেটা আঁচ করা সম্ভব নয়। ভদ্রলোক বেশ গোঁড়া।

ঘুমাতে যাবার আগেও আদিত্যর রিন্টুর বাড়ির পরিবেশটা মনে পড়ে যাচ্ছিল বারবার। সুশোভন চলে গেলে সে আবার গেছিল। দরজার বাইরে থেকেই উত্তেজিত কথোপকথন শুনতে পেয়েছিল সে। পুলিশ কেন এসেছে, আগে জানলে পুলিশের গলা নামিয়ে দিত, এই সমস্ত কথা শুনে সে আর দাঁড়ায়নি। সন্তর্পণে চলে এসেছিল। মানুষ এত মারমুখী কেন হবে অনেক ভেবেও সে বুঝে উঠতে পারেনি। বিয়ে হয়েছে, মেয়ে নিজের ইচ্ছাতেই বিয়ে করেছে, তাতে গলা নামিয়ে দেবে, এ জাতীয় ভাষা কেন ব্যবহৃত হবে? আদিত্য খানিকটা ভয়ই পেয়েছিল। অনেক রাত অবধি এপাশ ওপাশ করে শেষমেশ ঘুমিয়ে পড়েছিল সে।

ঘুম ভাঙল কলিং বেলের শব্দে।

ড্রয়িং রুমে এসে দেখল ঝুমকি আগেই দরজা খুলে দিয়ে আবার ঘরে চলে গেছে। সুশোভনের সঙ্গে আর-একজন মধ্যবয়স্ক অপরিচিত মানুষ। উর্দি পরে রয়েছেন। আদিত্য বুঝল ইনি সুশোভনের কলিগ।

সে সুশোভনকে বলল, “তোরা বোস, আমি একটু চোখে মুখে জল দিয়ে আসি।”

সুশোভন বললেন, “বেশ।”

আদিত্য বাথরুমে গিয়ে ব্রাশ করে, চোখে মুখে জল দিয়ে ড্রয়িং রুমে এল। সুশোভন তাঁর সঙ্গে আসা ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় করালেন, “আদিত্য, উনি জামান সাহেব। আমাদের সিনিয়র। তোর শালির ব্যাপারটা ওঁকে জানাতে উনি নিজেই কেসটার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করলেন।”

আদিত্য হাত জোড় করল।

জামান বললেন, “আমি সুশোভনের কাছে কাল রাতেই শুনলাম ব্যাপারটা। খুব আনফরচুনেট ব্যাপার ঘটেছে। এসব মানুষদের জন্যই কিন্তু কমিউনাল টেনশন তৈরি হয়।”

আদিত্য বলল, “আমারও তাই মনে হয়। ইন ফ্যাক্ট কাল আমি আর সুশোভন ছেলেটার বাড়িতে গিয়েছিলাম। সেখানে ওদের অ্যাগ্রেসিভ চেহারা আমার অন্তত ভালো লাগেনি। সুশোভন যদিও ব্যাপারটা বেশ ঠান্ডা মাথায় সামলে নিয়েছিল। কিন্তু আমার রীতিমতো ভয় লাগছিল ওদের অ্যাটিচিউড দেখে।”

জামান বললেন, “আমি নিজে ব্যাপারটা দেখতে চাই। আমার জন্মও খিদিরপুরে। এরকম কেস আমি দেখিনি এমন নয়, কিন্তু ইদানীং যেন এই ফ্রিকোয়েন্সিটা বেড়ে গেছে। কিছু

মানুষের জন্য গোটা ধর্মের লোকেদের দিকে তর্জনী উঠছে। আচ্ছা, মেয়েটিকে একটু ডাকা যাবে?"

আদিত্য বলল, "হ্যাঁ, যাবে, কিন্তু এখনই ওকে এসব ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ না করলেই ভালো হয়। একটা শকের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে ও।"

জামান হাত তুললেন, "তাহলে থাক। প্রথম স্টেপ হিসেবে আজকেই ছেলেটি এবং তার পরিবারের বিরুদ্ধে একটা এফআইআর করুন। মেয়েটিকে মেন্টাল সাপোর্ট দিন। এসব কেসে মেয়ের বাড়ির লোক লজ্জার ভয়ে পুরো ব্যাপারটাই চেপে গিয়ে অন্য কোনওখানে মেয়েটির বিয়ে ঠিক করে। সেটা করতে চাইলে আমার কোনও আপত্তি নেই, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি এই ধরনের ক্রিমিনালদের খোলা রাস্তায় দাঁড় করিয়ে এনকাউন্টার করে দেওয়া উচিত।"

সুশোভন বললেন, "স্যার, লাস্ট কয়েকটা বছরে স্টেটে কমিউনাল টেনশন বেড়েছে। এই ধরনের ঘটনা যদি সামনে আসে তবে স্বাভাবিকভাবেই..."

জামান বললেন, "সামনে আসার দরকার আছে। সমাজের স্বার্থেই সেটা দরকার আছে। এ ধরনের কাজকর্ম কোনওভাবেই সাপোর্ট করা যায় না।"

সুশোভন আদিত্যর দিকে তাকিয়ে বললেন, “তুই কী বলিস? ব্যাপারটা নিয়ে তোর শ্বশুরবাড়ি থেকে কোনওরকম মুভমেন্ট হবে?”

আদিত্য ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলল, “আগে ওর বাবা ওকে ঘরে ফিরিয়ে নিক। আমার তো যথেষ্ট ডাউট আছে, সেই প্রসেসটা শান্তিপূর্ণভাবে হবে নাকি সে সম্পর্কে। তারপরে তো লড়াইয়ের প্রশ্ন আসছে।”

জামান বললেন, “মেয়ে পালিয়ে গেলে মেয়ের ওপর বাপের অভিমান হওয়া স্বাভাবিক। আমার নিজেরও মেয়ে আছে। একজন মেয়ের বাপ হিসেবে ব্যাপারটা আমি ফিল করতে পারি। যাই হোক, এফআইআর-টা করুন। লড়াইটা শুরু হোক।”

আদিত্য বলল, “আমি আজ ওদের বাড়িতে ওকে নিয়ে যাই। তারপর কী প্রতিক্রিয়া হয় সুশোভনকে জানাচ্ছি। সেটা দেখে নাহয় পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করা যাবে?”

জামান উঠলেন, “বেশ, তাই হোক। আমাকে আপডেট দিতে থাকবেন।”

আদিত্য বলল, “নিশ্চয়ই। অনেক ধন্যবাদ।”

১৬

সম্রাট হুমায়ুন একমনে কিছু লেখার চেষ্টা করছিলেন। বেশ কিছুদিন ধরে তিনি কিছু লিখতে পারছেন না। মন বড়োই বিক্ষিপ্ত।

এমন সময় এক দাসী এসে খবর দিল বৈরাম খাঁ দেখা করতে এসেছেন।

হুমায়ুন বিরক্ত হলেন। কিন্তু বৈরাম খাঁকে আসার অনুমতিও দিলেন।

বৈরাম খাঁ সম্রাটের কক্ষে প্রবেশ করলেন।

হুমায়ুন বললেন, "কী ব্যাপার খাঁ সাহেব? বড়ো উতলা মনে হচ্ছে?"

বৈরাম খাঁ বললেন, "জাহাঁপনা, খুশি হবার মতো একটা খবর ঘটেছে বটে। অবশ্য একইসঙ্গে চিন্তা বাড়ারও পর্যাপ্ত কারণ রয়েছে।"

হুমায়ুন অবাক গলায় বললেন, "আমার খুশি হবার মতো ঘটনা? কী হয়েছে শুনি?"

বৈরাম খাঁ বললেন, "জাহাঁপনা, আপনার ভাই কামরান মির্জা আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করার উদ্দেশ্যে লোকলশকর জড়ো করছিল। সুখের কথা হল, শের শাহ সুরির সৈন্যরা তাদের একটা দলকে কচুকাটা করেছে সরাইখানার ভিতরে।"

হুমায়ুন শিউরে উঠে বললেন, “আমার ভাই ভালো আছে তো?”

বৈরাম খাঁ সম্রাটের প্রতিক্রিয়া দেখে খানিকটা অবাক হয়ে বললেন, “এই খবরে আপনার আর কোনও কিছু মনে পড়ল না?”

হুমায়ুন বললেন, “নাহ। আগে তো পরিবার। তারপরে সব কিছু। যাই হোক, কামরান ভালো আছে তো?”

বৈরাম খাঁ সম্রাটকে আশ্বস্ত করলেন, “হ্যাঁ জাহাঁপনা। ওঁর শরীরে আঁচটুকুও লাগেনি। তা ছাড়া উনি ঘটনাস্থলে ছিলেনও না। তবে রাজবিদ্রোহ দমন করা এই মুহূর্তে কঠিন কাজ হত। যা হয়েছে, ভালোর জন্যই হয়েছে। যদিও কামরান মির্জা চেষ্টা চালিয়ে যাবে। আমাদেরই সতর্ক থাকতে হবে যাতে কোনও গুপ্তঘাতক আপনার কাছে না ঘেঁষতে পারে।”

হুমায়ুন বললেন, “তাহলে ঠিক আছে। আর চিন্তা বাড়ার কারণ কী?”

বৈরাম খাঁ বললেন, “শের শাহ শক্তিবৃদ্ধি করছেন। আমার মনে হয়, আমাদের শের শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধপ্রস্তুতি নেওয়া উচিত।”

হুমায়ুন বললেন, "বেশ তো, আপনি প্রস্তুত করুন সকলকে। তরবারি ধরি না অনেকদিন হয়ে গেল।"

বৈরাম খাঁ বললেন, "অধৈর্য হবেন না জাহাঁপনা। এই মুহূর্তে শের শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রার কথা রাজ্যের সর্বত্র রটে গেলে কামরান মির্জা খুশিই হবেন। দিল্লির তখত খালি থাকবে। কামরান মির্জা বিদ্রোহীদের নিয়ে রাজধানী দখল করতে চলে আসবেন। এখন এই সংবাদ গোপন করা আমাদের আশু কর্তব্য। আমরা নিঃশব্দে প্রস্তুতি শুরু করব।"

হুমায়ুন বললেন, "বেশ। আর কিছু বলার আছে? না থাকলে আপনি যেতে পারেন।"

বৈরাম খাঁ খানিকটা নিরাশ হলেন। শের শাহ সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য সম্রাটকে দেবেন ঠিক করে এসেছিলেন। সম্রাটের মতিগতি দেখে বুঝতে পারলেন সেসব শুনতে সম্রাট একেবারেই আগ্রহী নন। তিনি নতজানু হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। হুমায়ুন নিজের কক্ষ থেকে বেরিয়ে বাইরে এলেন, জলাশয়ের কাছে এসে বসে জলে হাত চুবালেন। গ্রীষ্মকালে জল নিয়ে খেলা সম্রাটের প্রিয় কাজগুলোর মধ্যে একটা।

খাস বাঁদি মেহজাবিন সম্রাটের কাছে এসে দাঁড়াল। মুখে খানিকটা উৎসুক ভাব। হুমায়ুন বললেন, "কী সংবাদ মেহজাবিন? কিছু বলবে তুমি?"

মেহজাবিন বলল, "জাহাঁপনা কি আজকে হারেমে যাবেন?"

হুমায়ুন অবাক হলেন, বললেন, “কেন বলো তো?”

মেহজাবিন বলল, “এক হিন্দু মেয়ে গত কাল হারেমে এসেছে জাহাঁপনা। সমস্যা হল আসা ইস্তক মেয়ে কেঁদেই যাচ্ছে। কিছুতেই তাকে শান্ত করা যাচ্ছে না।”

হুমায়ুন বললেন, “হারেমে এসেছে? কী করে সম্ভব? বাদশাহী হারেমের আদৌ উপযুক্ত সে কন্যা?”

মেহজাবিন মাথা নিচু করে জানাল, মেয়েটিকে বিয়ে করার জন্য পালিয়ে নিয়ে এসেছিল তার এক আত্মীয়। ছেলেটির মা যখন বুঝতে পারেন মেয়েটি সুন্দরী এবং নিরাপত্তাহীন পথে কোথাও নিয়ে যাওয়া অসম্ভব, তখন ছেলেটিকে না জানিয়েই হিন্দু মেয়েটিকে বাদশাহি হারেমে পাঠিয়ে দেন মেহজাবিনের হাত দিয়ে। সমস্যা যদিও অন্য হয়েছে, মেয়েটি খাওয়া প্রায় ত্যাগ করেছে, সারাদিন ধরে কেঁদে চলেছে। এমন অবস্থায় যদি বাদশাহ একবার মেয়েটির সঙ্গে দেখা করেন, তাহলে হয়তো মেয়েটিকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হবে।

হুমায়ুন মেহজাবিনের দিকে চিন্তিত মুখে তাকিয়ে বললেন, “বেশ। চলো। পরখ করে আসি, কোন কোহিনূর এত পরম যত্নে তুমি আগলে রেখেছ। চলো।”

১৭

সুশোভনরা চলে গেলে আদিত্য কিছুক্ষণ চুপ করে ড্রয়িংরুমে বসে রইল। ঝুমকি এসে বলল, "ওঁরা পুলিশ? আমার ব্যাপারে এসেছিলেন?"

আদিত্য ঝুমকির দিকে তাকিয়ে বলল, "হ্যাঁ। তোর ব্যাপারে।"

ঝুমকি বলল, "আমার জন্য সবার মাথা নিচু হল।"

আদিত্য বলল, "এখন এই কথাটা বলে লাভ আছে ঝুমকি? তোর এটা আগে ভাবা উচিত ছিল। হিন্দু মুসলিমটা বড়ো কথা না, বাড়ি থেকে পালিয়ে যাবার কনসেপ্টটাই বা তুই এনকারেজ করলি কেন?"

ঝুমকি মাথা নিচু করে বসে থেকে বলল, "আমি ঘোরের মধ্যে ছিলাম।"

আদিত্য বলল, "সে কি আর আলাদা করে বলার দরকার পড়ে? কিন্তু দয়া করে চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে টাইপ কমেন্ট করিস না এখন।"

ঝুমকি কিছু বলল না।

আদিত্যর ফোন বেজে উঠল। সে দেখল রুমকি ফোন করছে। ঝুমকিকে বলল, "তোর দিদি ফোন করছে। চুপ করে থাকিস।"

ঝুমকি মাথা নাড়ল।

আদিত্য ধরল, "হ্যালো।"

"এই তুমি তোমার বন্ধুকে ফোন করো একবার শিগগিরি।"

ওপাশ থেকে রুমকির কাঁদো কাঁদো গলা ভেসে এল।

আদিত্য অবাক গলায় বলল, "কেন? কী হয়েছে?"

রুমকি বলল, "আরে আমি ঘুমাচ্ছিলাম। বাবা সামনের ঘরে ছিল। পাঁচ-ছটা ছেলে এসে বাবাকে হুমকি দিয়ে গেছে। ঝুমকি নাকি পালিয়েছে ওখান থেকে। বাবার বুক ধড়ফড় করছে। আমি ডাক্তার আঙ্কেলকে ফোন করেছি। আসছে। তুমি এসো প্লিজ। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। ঝুমকি কোথায় গেল?"

আদিত্য আঙুল দিয়ে মাথা টিপে কয়েক সেকেন্ড বসে থেকে বলল, "আমি আসছি। সুশোভনকেও বলছি। আপাতত পাড়ার লোকজনকে বলে রাখো তারা যেন উটকো লোক দেখলে তাড়া করে। ছেলেগুলোকে সুবিধার মনে হচ্ছে না।"

রুমকি বলল, "প্লিজ এসো। আমি আর চাপ নিতে পারছি না।"

ফোন রেখে আদিত্য সুশোভনকে ফোন করল। সুশোভন ধরলেন, "বল রে।"

আদিত্য বলল যা হয়েছে।

সুশোভন অস্ফুটে বললেন, "আনএক্সপেক্টেড ছিল না ব্যাপারটা। বরং আগে থেকে আমারই অ্যালার্ট করে দেওয়া উচিত ছিল। চিন্তা করিস না, আমি লোকাল থানায় ইনফর্ম করে সিকিউরিটির ব্যবস্থা করছি। তুই কি তোর শ্বশুরবাড়িতে এখনই ও যে ফিরে এসেছে সেটা বলে দিবি?"

আদিত্য বলল, "নাহ। ও বাড়িতে পরিস্থিতি ভালো না। এখন বললে হিতে বিপরীত হতে পারে। আমি ঝুমকিকে এ বাড়িতে রেখে যাচ্ছি। গিয়ে দেখি কী হাল।"

সুশোভন বলল, "ঠিক আছে। তুই যা। আমি থানায় বলে দিচ্ছি।"

ফোন রাখল আদিত্য। ঝুমকি চিন্তিত মুখে তার দিকে তাকিয়ে বলল, "কী হয়েছে?"

আদিত্য বলল, "শুনতে পেলি তো। তোর পেয়ারের রিন্টু ওরফে রুবেল লোক পাঠিয়েছে তোদের বাড়িতে। রীতিমতো হুমকি দিয়ে গেছে। কত বড়ো গ্যাংস্টার ছেলেটা?"

ঝুমকি এবার কাঁদো কাঁদো হল, "ওর খুব রাগ। আমি আগে একবার বুঝেছিলাম।"

আদিত্য হাত দিয়ে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গি করে বলল, "ওর রাগ খুব না কম, তাতে কারও যায় আসে না। এই যন্তরটাকে তুই এখন ভোলার চেষ্টা কর। দয়া করে সেন্টু খেয়ে আবার ওর কাছে ফিরে যাস না।"

ঝুমকি জোরে জোরে মাথা নাড়ল, "কখনোই না। কোনও দিনও আমি আর ফিরে যাব না।"

আদিত্য বলল, "ঠিক আছে। শোন, তুই এখানেই থাক। আমি তোদের বাড়িতে যাচ্ছি। ওদিকটাও তো সামলাতে হবে। তোর জ্বালায় আমার অফিস মাথায় উঠল যা বুঝতে পারছি। চাকরিটা থাকলে হয়।"

ঝুমকি কেঁদে ফেলল।

আদিত্য এবার নরম হয়ে বলল, “কাঁদিস না। ফ্রিজে চকোলেট আছে। খেয়ে নিস। এখনও নাক টিপলে দুধ বেরোয় আর মেয়ে চললেন বাড়ি থেকে পালাতে। যত্তসব!”

ঝুমকি নিঃশব্দে কাঁদতে থাকল।

আদিত্য আর দাঁড়াল না। স্নান, বাথরুম সব সেরে বাড়ি থেকে বেরোল। ঝুমকিকে বলল, “আমার নাম্বার ল্যান্ডলাইনের পাশের ডায়েরিতে আছে। কোনও সমস্যা হলে ফোন করবি। তোর যত চিন্তাই হোক বাড়িতে এখন ফোন করবি না, বুঝেছিস?”

ঝুমকি মাথা নাড়ল, “বুঝেছি।”

১৮

আদিত্য গাড়ি চালাচ্ছিল।

রুবি পেরোতে ফোনটা বাজতে শুরু করল। আদিত্য বিরক্ত হল। এমনিতেই কাঁচা হাত, গাড়ি চালানোর সময় খুব অ্যালার্ট থাকতে হয়।

রুবির মোড় পেরিয়ে খানিকটা এগিয়ে গাড়িটা বাঁদিকে দাঁড় করাল সে। আননোন নাম্বার। কল ব্যাক করল সে। ওপাশে একটা রিং হতেই ধরল, “হ্যালো।”

আদিত্য বলল, "কে বলছেন?"

"দাদা ভালো আছেন?"

আদিত্য গলাটা চিনল না। অবাক গলায় বলল, "কে বলছেন?"

"আমি রিন্টু বলছি দাদা। ওই কী যেন বলে না, ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে, আপনার ভায়রা ভাই।"

আদিত্য থমকাল। বলল, "আপনি আমার নাম্বার পেলেন কোত্থেকে?"

"কী যে বলেন দাদা, ঝুমকির মোবাইল থেকেই পেয়েছিলাম। আপনাদের সবার নাম্বারই আমার কাছে আছে।"

আদিত্য বলল, "ওহ, বেশ তো। তা আমাকে ফোন করলেন কেন?"

রিন্টু বলল, "অ্যাকচুয়ালি একটা বিপদে পড়ে আপনাকে ফোন করেছি দাদা।"

"কী বিপদ?"

"জানেন তো, ঝুমকির সঙ্গে আমার বেশ কিছুদিন ধরেই অ্যাফেয়ার চলছিল। আমি কিছু বলিনি জানেন তো, ও-ই ইনসিস্ট করত আমার সঙ্গে পালাবে বলে। ওর বাড়ি থেকে নাকি মানবে না। আমি ওকে বোঝাতাম যে দ্যাখো এগুলো ভাবা উচিত না, কিন্তু ও কিছুতেই মানতে চাইত না বুঝলেন তো দাদা। তারপর তো জানেনই কী ঘটে গেল।"

আদিত্য অবাক হল, ছেলেটার ভাষা অত্যন্ত মার্জিত।

সে বলল, "আচ্ছা, তো তারপর?"

"তারপর তো দাদা সবাই জানে। ঝুমকি পালিয়ে গেল। ও দেখল আমরা মুসলমান, মানতে পারল না। কিন্তু আপনিই বলুন দাদা, আজকালকার দিনে এসব কেউ দ্যাখে?"

আদিত্য বুঝল ঝুমকি যে তার ফ্ল্যাটে আছে সেটা রিন্টু জানে না। সে বলল, "আচ্ছা, আমি তো অতটা ওদের ব্যাপারে ঢুকি না, আমি দেখি কী হয়েছে, তারপর নাহয় আপনাকে ফোন করি?"

রিন্টু বলল, "শুনুন না, শুনুন না দাদা।"

আদিত্য বলল, "বলুন।"

রিন্টু বলল, “দেখুন দাদা, আমি ঝুমকিকে খুব ভালোবাসি। কথা দিচ্ছি বাকি জীবনে ওকে কোনওরকম কষ্ট দেব না। আপনি একটু দেখুন না, যদি সব কিছু ঠিকঠাক করে দিতে পারেন।”

আদিত্য বলল, “দেখুন ভাই, এটা তো আমার শ্বশুরবাড়ির ব্যাপার, এসব ব্যাপারে আমি খুব কম ঢুকি। যদি আমার কোনও ওপিনিয়ন নেয়, তখন নাহয় আমি দেখব, কেমন? এখন আমি শ্বশুরবাড়িই যাচ্ছিলাম, কোথাকার কিছু লাথখোর ছেলে নাকি ওদের বাড়িতে এসে হুমকি দিয়ে গেছে, আমার বন্ধু তো লালবাজারে আছে, দেখি যদি কিছু করা যায় নাকি।”

আদিত্যকে অবাক করে রিন্টু চেঁচিয়ে উঠল, “এই শুয়োরের বাচ্চা, মাদারচোদ, লাথখোর কাকে বলছিস বে? আমার ভাই হয় ওরা! খোঁজ নিতে গেছিল।”

আদিত্য হেসে ফেলল, “এই তো ভাই, আপনার আসল রূপ বেরিয়ে পড়ল। শুয়োরের খোঁয়াড়ে থাকা শুয়োরকে লাঠির বাড়ি মারলে তার যে আসল রূপ বেরোবে এ তো জানাই ছিল।”

রিন্টুর গলার নিমেষে পরিবর্তন হল, “সরি সরি দাদা, আমার মাথার ঠিক নেই তো, হঠাৎ এক্সাইটমেন্ট চলে এসেছিল। আপনি প্লিজ কিছু মনে করবেন না দাদা।”

আদিত্য বলল, “আমি কিছু মনে করিনি, তবে আপনি যেটা করেছেন, সেটা ঠিক করেননি। আপনি ঝুমকিকে বলেননি আপনি অন্য ধর্মের মানুষ, তাই না?”

রিন্টু বলল, “সেটা আপনি কী করে জানলেন?”

আদিত্য সতর্ক হল, বলল, “অনুমান করাই যায়। আপনার কথা শুনে সেরকমই মনে হয়েছে আমার।”

রিন্টু বলল, “ধর্মটা কি ম্যাটার করে আজকাল? আপনিই বলুন?”

আদিত্য বলল, “ম্যাটার করে না। সত্যিই করে না। ধর্ম একটা ইউজলেস ব্যাপার। কিন্তু জোরজারি করে কিছু করাটাও ক্রিমিনাল অফেন্সের আন্ডারে পড়ে, এটা বোধহয় আপনি বা আপনারা জানেন না। শুনুন, ঝুমকি আমার বোনের মতো, ওর কোনও ক্ষতি হোক আমরা চাইব না। আমরা থানায় মিসিং ডায়েরি করছি, ওকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বলে, আপনি বরং এর ফলাফলের জন্য প্রস্তুত থাকুন। পুলিশকে সাহায্য করুন, দেখা যাক কী হয়।”

রিন্টু কয়েক সেকেন্ড চুপ থেকে ফোনটা কেটে দিল।

১৯

কাঁদো কাঁদো মুখে রুমকি দরজা খুলল। আদিত্য ঘরে ঢুকে দেখল বিকাশ বসে আছেন। মুখটা বিরক্তিতে একটু কুঁচকেই ঠিক করে নিল সে। রুমকি এরকম মুখ দেখলে অশান্তি করে।

বিকাশ তাকে দেখে দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, “দেখলে বাবাজীবন? সেকুলার হওয়ার সমস্যা? যাদের ভয়ে বর্ডার পেরিয়ে এসেছিলাম, তারা শুধু মেয়েই তুলে নিয়ে যাচ্ছে না, সঙ্গে বাড়ি বয়ে এসে হুমকিও দিয়ে যাচ্ছে।”

আদিত্য সোফায় বসে শ্বশুরের দিকে তাকাল। তপন খানিকটা ভেবলে গেছেন বোঝা যাচ্ছে। সামনের টেবিলে জলের বোতল রাখা। আদিত্য বোতল থেকে খানিকটা জল খেয়ে বলল, “ভয় পাওয়ার কিছু নেই, সুশোভন ব্যবস্থা করছে বলেছে।”

রুমকি বলল, “ঝুমকির কী হবে? ও পালিয়ে কোথায় গেছে কিছুই তো বুঝতে পারছি না। ওইটুকু একটা বাচ্চা মেয়ে...”

রুমকি কথা শেষ করতে পারল না। মুখে আঁচল দিল।

তপন বিরক্ত গলায় বললেন, “বাচ্চার কিছু নেই তো। পালিয়ে বিয়ে যখন করতে পেরেছে তখনই বড়ো হয়ে গেছে। এসব ফালতু কথা বলিস না।”

বিকাশ উদগ্রীব গলায় বললেন, "ওরা আবার কনভার্ট করে বেচে দেয় জানো তো?"

আদিত্যর মুখে খিস্তি আসছিল। অনেক কষ্টে সেটা আটকে সে বলল, "আমরা তো এখনও কিছু জানি না। কিছু না জেনে বলাটা কি ঠিক হচ্ছে?"

তপন বললেন, "কিছু না জানলেও, যেসব ছেলেরা এ বাড়িতে এসেছিল, তাদের দেখে খানিকটা আন্দাজ করাই যায় আমার মেয়ে কোন বাড়িতে গেছে। লাথখোর, লুম্পেন টাইপ ছেলে একেবারে সবকটা। আর চোখ কী তাদের, বাপরে...।"

রুমকির মা দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন চুপ করে। বোঝা যাচ্ছে ভয় পেয়েছেন। বিকাশ বললেন, "আমি পাড়ার ছেলেদের খবর দিয়েছি। পুলিশ কী করবে সেটা তো বুঝে উঠতে পারছি না, আপাতত পাড়ার লোকেরা একটু দেখুক।"

তপন মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, "ছি ছি ছি ছি। এত নিষ্ঠাসহকারে পুজো করি আমি, জ্ঞানত কোনও দিন কারও কোনও ক্ষতি করিনি, সেই আমার মেয়েই কিনা এত বড়ো... ভাবতেই পারছি না।"

রুমকি আদিত্যর দিকে তাকাল, "সুশোভনরা কোনওরকম কিছু জানতে পারল?"

আদিত্য বলল, “হ্যাঁ, ঝুমকিকে ওরা ধানবাদে নিয়ে গেছিল। ঝুমকি সম্ভবত জানত না ছেলেটা অন্য ধর্মের, ও ওখান থেকে পালাতে পেরেছে। এটুকু জানা গেছে।”

তপন বিকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, “দেখলে? জানত না নাকি। যদি নিজের জাত ধর্মেরই হত, তাহলেই বা পালিয়ে তুই কী রাজকাজটি করতি? এদের প্রতিপালনেই সমস্যা ছিল আমার। আমারই ব্যর্থতা।” তপন দৃশ্যতই ভেঙে পড়লেন।

বিকাশ বললেন, “এই যে ছেলেগুলো এসেছিল, সব কোন ভাষায় কথা বলছিল?”

তপন বললেন, “উর্দু বা হিন্দু কিছু একটা হবে। একেবারেই অবাঙালি টানে কথা বলল।”

বিকাশ বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে বললেন, “হুঁ, বুঝেছি, এইসব ছেলেছোকরাই ইন্ডিয়া-পাকিস্তান ম্যাচে পাকিস্তানকে সাপোর্ট করে। নিজেদের জায়গায় যতরকম ক্রাইম করে বেড়াবে। বলার কেউ নেই তো। গন্ডায় গন্ডায় বাচ্চা পয়দা করে জনসংখ্যা বৃদ্ধি করা আর হিন্দু ঘরের মেয়ে বিয়ে করা ছাড়া এদের কোনও কাজ নেই। নেহাত আমি ছিলাম না তাই, থাকলে দেখিয়ে দিতাম...”

আদিত্য আড়চোখে বিকাশের দিকে তাকাল। সামান্য হাওয়া দিলে উড়ে যাওয়া চেহারা। অতি কষ্টে হাসি চাপল সে।

কলিং বেল বাজল। রুমকি খানিকটা শিউরে উঠল। আদিত্য উঠে বলল, "আমি দেখছি।"

রুমকি বলল, "দাঁড়াও আগে জানলা দিয়ে বাইরেটা দেখে নি।"

বাইরের জানলা দিয়ে রাস্তা দেখে আশ্বস্ত হয়ে রুমকি দরজা খুলল। পাড়ার কয়েকজন লোক এসেছে। বোঝা যাচ্ছে ঘটনাটা পাড়ায় উত্তেজনা ছড়াচ্ছে। আদিত্য রুমকিকে বলল, "তুমি একটু ভেতরের ঘরে এসো, কথা আছে।"

রুমকি বলল, "কী কথা?"

আদিত্য বলল, "চলো, বলছি।"

রুমকি আর আদিত্য ভেতরের ঘরে গেল। বাইরের ঘর থেকে উত্তেজিত লোকজনের কথোপকথন ভেসে আসছে। সবথেকে বেশি আসছে বিকাশের গলার স্বর।

রুমকি ঘরে ঢুকলে আদিত্য আড়চোখে একবার বাইরেটা দেখে নিয়ে বলল, "শোনো, এখানে তো যা হবার হয়ে গেছে, আমার অফিস যাওয়া হচ্ছে না, তুমি আপাতত আমার সঙ্গে চলো।"

রুমকি তার দিকে ভস্ম করে দেওয়া দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, "মানে? তুমি চাইছ এই পরিস্থিতিতে আমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাই?"

আদিত্য বলল, "সেটা তো বলিনি, তুমি এসো, কিন্তু আমিও তো ওদিকে একা আছি। সমস্যা হচ্ছে..." আদিত্য বলতে পারছিল না ঝুমকি তাদের ফ্ল্যাটে এসেছে। জানলেই হয়তো রুমকি চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করবে।

রুমকি জোরে জোরে মাথা দুদিকে নাড়িয়ে বলল, "কখনও না। বাবা-মাকে এই অবস্থায় ফেলে আমি কোথাও যাব না। বরং তুমিও এখন এই বাড়ি থেকেই অফিস যাতায়াত করো।"

আদিত্য বলল, "সম্ভব না। নর্থের জ্যাম ঠেলে অফিস পৌঁছোতে হলে আমার অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে।"

রুমকি রেগে গিয়ে বলল, "তা তো বলবেই। শুধু সব কিছু থেকে পালিয়ে পালিয়েই গেলে। যাও, যেখানে ইচ্ছে যাও, আমাদের দিকে তোমার না দেখলেও হবে। আর শুনে রাখো, যতদিন না ঝুমকি বাড়ি ফিরছে, আমি কোথাও যাচ্ছি না।"

আদিত্য দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

২০

সুশোভন দুজন কনস্টেবল পাঠিয়ে দিলেন কিছুক্ষণের মধ্যেই। আদিত্য আর বসল না। রুমকির থমথমে মুখের মধ্যেই শ্বশুরবাড়ি থেকে বেরিয়ে গাড়ি স্টার্ট দিল।

শ্বশুরবাড়িতে মেলা বসে গেছে এখন। বিভিন্ন লোক এসে মতামত দিয়ে যাচ্ছে। আদিত্যর বিরক্ত লাগছিল থাকতে। শাশুড়ি খেয়ে যেতে বললেও সে থাকল না। এত ঘেন্না সে আর নিতে পারছিল না। অসুস্থ লাগছিল।

চারদিকটা কীভাবে যেন ধর্ম ধর্ম করে খেপে উঠেছে। এই মানুষগুলোকে সে নতুন করে চিনছে। ধর্ম সম্পর্কে এত সজাগ কলকাতার মানুষ কি আগে কোনও কালে ছিল? মনে করতে পারল না সে।

বেশ খানিকটা রাস্তা যাবার পর তার ঝুমকির কথা মনে পড়ল। একটা রেস্তোরাঁয় গাড়ি দাঁড় করিয়ে ফ্রায়েড রাইস, চিলি চিকেন প্যাক করে নিল। দরজায় যখন বেল বাজাল তখন দুপুর হয়েছে। ঝুমকি বেশ খানিকক্ষণ সময় নিয়ে দরজা খুলল। চোখ মুখ ফোলা। আদিত্য বলল, "ঘুমাচ্ছিলি?"

ঝুমকি বলল, "হ্যাঁ, খুব টায়ার্ড লাগছিল। ও বাড়ির কী খবর?"

আদিত্য হাতের প্যাকেট ঝুমকির দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, “ভাগ কর। আমিও খেয়ে নি। ও বাড়ির খবর আর কী, পুলিশ মোতায়েন হয়েছে। আর তোর রোমিও আমাকে ফোন করেছিল তো!”

ঝুমকি অবাক হয়ে আদিত্যর দিকে তাকিয়ে বলল, “মানে? কখন?”

আদিত্য বলল, “আগে খেয়ে নে। সকাল থেকে তো কিছুই খাসনি মনে হয়।”

ঝুমকি বলল, “বিস্কুট খেয়েছি। আচ্ছা খেয়ে নি। আর শুনতেও ইচ্ছা করছে না আমার।”

আদিত্য টেবিলে বসল। ঝুমকিই খাবার ভাগ করে দিল।

টিভি চালাল আদিত্য। কোথায় একটা ঝামেলা লেগেছে। র‍্যাফ নেমেছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। চারদিকে ঝামেলা শুধু।

ঝুমকি কিছুটা খেয়ে বলল, “আমি আর পারছি না। খেতে ইচ্ছা করছে না।”

আদিত্য ধমকাল, “চুপচাপ খেয়ে নে। কষ্ট হলেও খা। খালি পেটে থাকবি না। তোর দিদিকে তো আনার চেষ্টা করলাম, বুঝে উঠতেই পারল না কেন আসতে বলছি। এল না।”

ঝুমকি বলল, "আমি কী করব? ফিরে যাব ও বাড়ি?"

আদিত্য বলল, "কোন বাড়ি? খিদিরপুর?"

ঝুমকি বলল, "না না, আমাদের বাড়ি।"

আদিত্য খেতে খেতে বলল, "আমাদের এই যে সমাজ না কী একটা জিনিস আছে না, এখানে একটা কথা বারবার বলা হয়। বিয়ে হয়ে যাবার পর মেয়েদের নাকি শ্বশুরবাড়িটাই আসল। একটা মেয়ের মতামত নেওয়ার প্রয়োজন পর্যন্ত বোধ না করা এই সমাজ শ্বশুরবাড়িটাকেই তার নিজের বাড়ি বানিয়ে দেয়। তোর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অবশ্য অন্য। তোর শ্বশুরবাড়ি তুই নিজেই পছন্দ করেছিলি। কিন্তু তাদের স্বরূপটা বোঝার চেষ্টা করিসনি। যখন জানতে পেরেছিস, তৎক্ষণাৎ পালিয়ে এসেছিস। এবারে তোর রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ বাবা তোকে ফিরিয়ে নেবেন কি না, বা তাঁর বাড়িটাকে তোর বাড়ি বলে আর স্বীকৃতি দেবেন কি না, সেটাই লাখ টাকার প্রশ্ন। আমি অনেক বিয়েই দেখেছি, মেয়ের সিঁদুর ধুইয়ে, শাঁখা ভেঙে বাবা অন্য জায়গায় পাচার করে দিয়েছে, বিয়ে মানেনি। কিন্তু তোর বাবা কী করবেন সে সম্পর্কে আমি একেবারেই অন্ধকারে।"

ঝুমকি বলল, "জানি। এ সব কিছুর জন্য আমি দায়ী। তিন দিন পিছিয়ে দেওয়া যেত যদি সময়টা, কী ভালোই না হত বলো?"

আদিত্য হাসল। ফোনটা পকেট থেকে বের করে রিন্টুর রেকর্ডেড কথাগুলো শোনাল। ঝুমকি সবটা মন দিয়ে শুনে বলল, "আমি এখনও ওকে মেলাতে পারছি না।"

আদিত্য বলল, "স্বাভাবিক। দুনিয়ায় যত মানুষের মুখ আর মুখোশ আলাদা, দুনিয়াটা তত জটিল। এই ছেলেটার মুখোশ আর মুখ দুটোই তুই দেখেছিস। কনভার্শন বা একটা ধর্ম চেঞ্জ করলেই কি সব হয়ে গেল? সব কিছু কি এতই সোজা?"

ঝুমকি বলল, "আমার আর ভাল্লাগছে না কিছু। কী করব তুমিই বলো।"

আদিত্য বলল, "এখানে থাক। দেখা যাক কী করা যায়।"

২১

সুশোভন যখন তার অফিসে ঢুকলেন, তখন বিকেল চারটে। আদিত্যর শ্বশুরবাড়িতে দুজন কনস্টেবল মোতায়েন করতে উপরমহল থেকে অনুমতি নিতে হয়েছে।

ডিউটির প্রতিটা দিনই আজকাল ঘটনাবহুল হয়। নিজের মানবিক সত্তাটাও কর্তব্যের খাতিরে হারিয়ে যেতে বসে। মাঝে মাঝে সুশোভনকে আবার সব কিছু নতুন করে ভাবতে হয়। পুলিশের চাকরির মতো ভয়াবহ চাকরি বোধহয় আর কিছু হয় না। হয় সব

কিছু মেনে নিতে হবে, নয়তো একেবারে বিদ্রোহী হতে হবে। সব নৌকায় পা দিয়ে পুলিশের চাকরি করার জন্য এলেম থাকা দরকার, যেটা সবার থাকে না।

বেশ কয়েকটা কেস ফাইল টেবিলে এসেছিল ডাক ফাইলে, সুশোভন একটা করে ফাইল ছাড়ছিলেন, এমন সময় তাঁর মোবাইলটা বেজে উঠল।

সুশোভন নম্বরটা চিনতে পারলেন না, তবু ধরলেন, "হ্যালো।"

"আমি ইজাজ মল্লিক বলছি অফিসার। চিনতে পারছেন তো?"

কথাটা ভেসে আসতে একটু থমকে গেলেন সুশোভন। ইজাজ মল্লিক? তাঁকে ফোন করছে? কেন? তিনি খানিকটা সতর্ক গলাতেই বললেন, "পারছি। বলুন।"

"একটা মিসিং ডায়েরি করাতে হবে, বুঝলেন অফিসার। আমার এক ভাইপোর বউ গতকাল রাত থেকে মিসিং হয়েছে। আপনি এই ব্যাপারে কোনওরকম সাহায্য করতে পারবেন?"

সুশোভন অবাক গলায় বললেন, "নিশ্চয়ই পারব, তবে আপনাকে লোকাল থানায় এফআইআর করতে হবে, আপনি আমাকে ফোন করলেন কেন, বুঝতে পারলাম না তো!"

ইজাজ মল্লিক হেসে নিয়ে বলল, "আসলে ব্যাপারটা আপনিই হ্যান্ডেল করছেন শুনলাম। কাল আমার ভাইয়ের বাড়িতেও গেছিলেন খিদিরপুরে। তো আপনিই যখন দেখছেন, তখন আপনাকে ফোন করাটাই তো সমীচীন হবে, তাই না অফিসার?"

সুশোভন এবার বুঝলেন। একটু চুপ করে থেকে বললেন, "বুঝেছি। মেয়েটা মিসিং হয়েছে ধানবাদ থেকে। আপনারা ওখানে এফআইআর করার ব্যবস্থা করুন।"

"ধুস! কী যে বলেন! আমার কথা ধানবাদে কেউ শুনবে নাকি অফিসার? আমি কি ধানবাদের নেতা বলুন তো? আমি তো এখানকার নেতা। যে যেখানকার নেতা, সে তো সেখানেই ব্যবস্থা নেবে নাকি? শুনুন না, আপনি বরং এখান থেকেই ধানবাদে যোগাযোগ করে দেখুন। বাচ্চা মেয়ে, কোথায় হারিয়ে যাবে, কী থেকে কী হয়ে যাবে, কে দায়িত্ব নেবে বলুন তো?"

শেষের কথাগুলো অনেকটা হুমকির মতো শোনাল।

সুশোভন বললেন, "আপনাকে আমি বলেছি স্যার, আপনি ধানবাদ থানায় ডায়েরির ব্যবস্থা করুন। আমি এখন অন্য কাজে ব্যস্ত আছি। এ ব্যাপারে আপনাকে কোনওরকম সাহায্য করতে পারব না।"

"হা হা হা হা" ওপাশ থেকে জোরে হাসির শব্দ ভেসে এল, "আপনি কাকে কী বলছেন বুঝতে পারছেন তো?"

সুশোভন বললেন, "আমি বাজে কোনও কথা বলেছি বলে মনে তো হয় না।"

ইজাজ বললেন, "মেয়েটার বাড়িতে ভেড়ুয়া পুলিশ বসিয়েছেন কেন? কী ভাবছেন, ওই দুজন সব কিছু সামলে নিতে পারবে? আপনি জানেন ওদের ক্ষমতা? কিংবা ধরুন, ছেলেটা মেয়েটার দুঃখে, অপমানে সুইসাইড করে বসল, তখন কী করবেন বলুন তো? কিছু করার থাকবে? মোমবাতি মিছিলগুলো সব তো আপনার লাশ চাইবে অফিসার। পালিয়ে কোথায় যাবেন তখন?"

সুশোভন বললেন, "দেখুন স্যার, আমি আমার কর্তব্য করেছি মাত্র। এই মুহূর্তে আমি আর কোনও কথা বলতে পারছি না। ধন্যবাদ।"

ইজাজ কিছু বলার আগেই ফোনটা কেটে দিলেন সুশোভন। ঠান্ডা মাথায় ঘটনাটা বোঝার চেষ্টা করলেন তিনি। ব্যাপারটা খুব একটা সাধারণ জায়গায় থাকছে না। রাজনৈতিক রং নিচ্ছে। একটা ইস্যু হয়ে যাবে। ব্যাপারটা পুরোটাই বসকে জানানো দরকার। ওঠার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, এমন সময় দেখলেন ফোনটা আবার বেজে উঠল। মানালি, সাংবাদিক। সুশোভন একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে ধরলেন, "বলুন।"

“স্যার, একটু কথা বলা যাবে?”

“বলুন।”

“এইমাত্র আমাদের কাছে খবর এল পুলিশ নাকি এক মুসলিম ছেলে এবং এক হিন্দু মেয়ের সম্পর্কে হস্তক্ষেপ করেছে। মেয়েটি নিখোঁজ, ছেলেটি পাগলের মতো হয়ে গেছে। এবং এই কেসটা আপনিই হ্যান্ডেল করছেন, খবরটা একটু এক্সপ্লেন করবেন প্লিজ?”

সুশোভন দীর্ঘশ্বাস ফেলল। যা ভয় পেয়েছিলেন, তাই হতে চলেছে।

২২ ।।পূর্ব কথা।।

রাধা যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিল।

মেহজাবিনকে ডেকে আনল এক বাঁদি। মেহজাবিন বাঁদির দিকে তাকিয়ে বলল, “কতক্ষণ হল এরকম করছে?”

বাঁদি বলল, “কাল রাতে বাদশাহ যাবার পর থেকেই।”

মেহজাবিন রাধার বিছানা দেখল। বিছানায় চাপ চাপ রক্ত। সে বাঁদিকে ধমক দিল, “পরিষ্কার করিসনি কেন?”

বাঁদি কাঁচুমাচু মুখে বলল, "দেখিনি।"

মেহজাবিন বাঁদিকে জোরে চড় মারল। বাঁদি চড় খেয়ে তড়িঘড়ি রাধার বিছানা পরিষ্কার করতে শুরু করল।

মেহজাবিন রাধাকে জোর করে তুলল। অস্ফুটে বলল, "এ মেয়ে তো আমাদের ভাষা বুঝবে না।"

রাধাকে ইশারায় বোঝাল তার সঙ্গে যেতে। রাধা উত্তর দিল না। মেহজাবিন রাধাকে হারেমের জলাশয়ে নিয়ে গেল। অন্যান্য মেয়েরা সেখানে হাসাহাসি করতে করতে স্নান করছিল। মেহজাবিনকে সবাই ভয় পায়। দেখা মাত্র চুপ করে গেল। মেহজাবিন রাধাকে যত্ন করে স্নান করিয়ে, গা মুছিয়ে হারেমের একটা ঘরে নিয়ে গেল।

এক ষোড়শী মেয়ে শুয়ে ছিল। মেহজাবিন রাধাকে সে মেয়ের পালঙ্কে শুইয়ে দিয়ে বলল, "ওকে দেখিস তো রুকসানা। কাল..." ইশারায় বোঝাল বাদশাহ কী করেছেন রাধাকে।

রুকসানা ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হেসে রাধাকে জিজ্ঞেস করল, "নাম কী? কোথা থেকে এসেছিস?"

রাধা অবুঝ চোখে একবার রুকসানা, একবার মেহজাবিনের দিকে তাকাল।

মেহজাবিন রুকসানাকে বলল, "অন্য মুলুক থেকে এসেছে রে। আমাদের ভাষা বোঝে না।"

রুকসানা কোনও কারণ ছাড়াই হি হি করে হাসল।

মেহজাবিন বলল, "আমি যাই, তুই একে দেখে রাখ। অন্য কিছু দিয়ে ভুলিয়ে রাখ। প্রথম বার তো, এরপরে তো সেই আবার আমাদের মতো হাপিত্যেশ করে বাদশাহের জন্য বসে থাকবে।"

মেহজাবিন হাসল, রুকসানাও। রুকসানা বলল, "আচ্ছা, তুমি যাও। আমি ওর সঙ্গে আলাপ করি।"

মেহজাবিন বলল, "খাইয়ে দিস পারলে। হুজুরের যদি ওকে পছন্দ হয়ে থাকে তবে আবার আসবেন হয়তো।"

রুকসানা ছদ্ম শ্বাস ফেলে বলল, "অত সৌভাগ্য কি আর সবার হয়?"

মেহজাবিন বলল, "হতেই পারে। যে মেয়ের রহস্য যত বেশি, পুরুষমানুষ তত বেশি তার কাছে আসে। এ মেয়ের ভাষা তো বাদশাহ বোঝেননি, তাই এই মেয়ের আকর্ষণ বেশি হবে।"

রুকসানা বলল, "ঠিকই বলেছ। আমরাও সেরকম অভিনয় করতে পারলে ভালো হত বলো?"

রুকসানা আর মেহজাবিন খিলখিল করে হেসে উঠল।

মেহজাবিন বলল, "দেখিস একে। আমি যাই।"

মেহজাবিন চলে গেল।

রাধার গলায় একটা ঝকঝকে মুক্তোর মালা। রুকসানা সেটায় হাত বুলিয়ে বলল, "মাশাল্লাহ। বাদশাহ দিয়েছেন? আমাকেও দিয়েছিলেন প্রথমবার।"

রাধার তলপেটে ব্যথা করছিল।

গতকালের কথা সে আর মনে করতে চাইছিল না।

রুকসানা ইশারায় রাধার তলপেটের দিকে হাত দিয়ে বোঝাল তারও ব্যথা হয়েছিল প্রথমবারে।

রাধা তাকিয়ে রইল রুকসানার দিকে।

রুকসানা রুপোর পাত্রে জল এনে দিল। রাধার শরীর কাঁপছিল। কোনওমতে খানিকটা জল খেতে পারল।

রুকসানা রাধাকে শুইয়ে দিল আবার। ফিসফিস করে বলল, “তোর মতো আমারও হয়েছিল রে। এভাবেই।”

রাধা রুকসানার ভাষা না বুঝলেও বুঝতে পারল রুকসানা কী বলতে চাইছে।

সে ফুঁপিয়ে উঠল, “মার কাছে যাব।”

রুকসানা রাধার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল পরম মমতায়।

রাধার দু চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমে এল।

রুকসানা বলল, “আম্মির কথা মনে পড়ছে? আমার তো গোটা পরিবারকেই মেরে দিয়েছিল বাবর শাহের সেনা। এখানে যখন নিয়ে এসেছিল ওরা, আমিও তোর মতোই ছিলাম। কিছু বুঝতাম না। বাদশাহ হুমায়ুন কত আদর করলেন আমায়। তারপর সে কী ব্যথা! তোর তো আমি আছি। আমার কেউ ছিল না।”

রাধা কাঁদতে লাগল।

রুকসানা উঠে একটা বাক্স নিয়ে এল। বাক্সটা খুলে বেশ কয়েকটা গয়না বের করে রাধাকে দেখিয়ে ইশারায় বলল, “বাদশাহ দিয়েছেন। উনি খুশি হলে আমরা খুশি। বুঝেছিস?”

রাধা উঠে বসল কোনওভাবে।

মেহজাবিন প্রায় দৌড়ে রুকসানার ঘরে ঢুকল, “বাদশাহ স্বয়ং আসছেন এই মেয়েকে দেখার জন্য।”

রুকসানা অবাক হয়ে রাধার দিকে তাকিয়ে বলল, “মাশাল্লাহ! হুজুরকে কী জাদু করেছিস রে মেয়ে?”

বাদশাহ এলে হারেমে হইহই রব পড়ে যায়। বাদশাহ ব্যতীত অন্য কোনও পুরুষের হারেমে প্রবেশ নিষেধ।

বাদশাহ হুমায়ুন সরাসরি রুকসানার ঘরে প্রবেশ করলেন। মেহজাবিন আর রুকসানা বাদশাহকে সেলাম করে মাথা নিচু করল। রাধা শুয়ে ছিল।

বাদশাহ এসে রাধার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে মেহজাবিনকে বললেন, "ওর কি শরীর খুব খারাপ? হাকিমকে দেখানোর দরকার আছে?"

মেহজাবিন হাসল, "না হুজুর, এ তো সব মেয়েরই হয় প্রথমবারে।"

বাদশাহ রাধার দিকে তাকিয়ে মেহজাবিনকে বললেন, "আমি বৈরাম খাঁকে বলেছি বঙ্গদেশ থেকে কোনও দোভাষীকে নিয়ে আসতে। এ মেয়ে কী বলছে তা জানতে চাই।"

মেহজাবিন আর রুকসানা পরম বিস্ময়ে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

২৩

দোভাষী খুঁজতে বঙ্গদেশে লোক পাঠাতে হয়নি। পাওয়া গেছে রাজধানীতেই।

সমস্যা হল বাদশাহর হারেমে বাদশাহ ব্যতীত অন্য কোনও পুরুষের প্রবেশ নিষেধ। মেহজাবিন ভেবেছিল বাদশাহ ভুলে যাবেন কথাটা বলে।

বাস্তবে দেখা গেল বাদশাহ ভোলেননি।

উজিরদের সঙ্গে বৈঠকের শেষেই ডেকে পাঠালেন মেহজাবিনকে।

মেহজাবিন বাদশাহকে অভিবাদন করে দাঁড়াল।

বাদশাহ বললেন, “কী ব্যবস্থা হল মেয়েটির?”

মেহজাবিন বলল, “জনাব, একজনকে পাওয়া গেছে। সমস্যা হল সে পুরুষমানুষ।”

বাদশাহ বললেন, “তাতে কী হয়েছে? মেয়েটির সঙ্গে ওর দেখা করার ব্যবস্থা করা হোক। মেয়েটি কী চায় দ্যাখো।”

মেহজাবিন শিউরে উঠে বলল, “সে কী জনাব, অচেনা অজানা একটা লোককে শাহি হারেমে নিয়ে যাব?”

বাদশাহ বললেন, "অচেনা অজানা লোক হারেমে যেতে পারবে না তো কী হয়েছে, মেয়েটিকে তো হারেমের বাইরে আনাই যায়, তাই না? তুমি ব্যবস্থা করো, আমিও থাকতে চাই।"

মেহজাবিন বাদশাহকে সালাম করে ঘর থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হারেমের দিকে যেতে যেতে মনে মনে বলল, "অনেক কপাল করে এসেছিলি মেয়ে, তোর কথা শুনতে চান স্বয়ং বাদশাহ। আমাদের কথা শোনার সময় নেই যাঁর, তোর কথা শোনার জন্য অধীর আগ্রহে বসে আছেন তিনি।"

রাধা রুকসানার খাটে ঘুমিয়ে ছিল। মেহজাবিন সেখানে উপস্থিত হয়ে রুকসানাকে বলল বাদশাহের কথাগুলো।

রুকসানা গালে হাত দিয়ে বলল, "সত্যি কী নসিব করে এসেছে এই মেয়ে। ইস, আমাদের ভাষা কেন বাদশাহের ভাষার থেকে আলাদা হল না?"

মেহজাবিন রাধাকে ধাক্কা দিয়ে ঘুম থেকে তুলল। রাধা চমকে উঠে বসল। কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছিল সে।

মেহজাবিন রুকসানাকে বলল, "ওকে বুরখা পরিয়ে নিয়ে চল। আমাদের কথা কিছুই তো বুঝবে না। বেরোতে হবে, এটুকু বুঝিয়ে দে।"

রুকসানা রাধার মুখের দিকে তাকিয়ে মেহজাবিনকে বলল, "বাদশাহ ওর কথা শুনে কী বলবেন? এই মেয়ের বাড়ি ফেরা ছাড়া আর কোনও চাহিদা থাকতে পারে? আমাদেরও তো বাড়ি যেতে ইচ্ছা করে, কিন্তু বাড়ির লোক কি কোনও দিনও আমাদের আর ফিরিয়ে নেবে?"

মেহজাবিন উঠে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "কোনও অযোগ্য পুরুষের ফাইফরমাশ খাটার থেকে বাদশাহের হারেমের মেয়েছেলে হওয়া অনেক ভালো। অন্তত এ দেশের বাদশাহ তো কিছুক্ষণের জন্য হলেও আমার শরীর আদরে স্পর্শ করেছেন। তুই ওকে তৈরি কর রুকসানা। এসব বেফুজুল কথা এখন আর বলে লাভ নেই।"

মেহজাবিন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

#

দুর্গের একটি কক্ষে পর্দা টাঙানো হয়েছে। মেহজাবিন, রাধা এসে বসেছে পর্দার একপাশে। অন্য পাশে অনুবাদককে নিয়ে আসা হয়েছে।

হিন্দু পণ্ডিত। মেহজাবিন পণ্ডিতকে বলল, "মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করুন ও কী চায়।"

পণ্ডিত গলা তুলল, “কী চান আপনি?”

রাধা অনেক দিন পরে নিজের ভাষা শুনে কেঁদে ফেলল। প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, “আমি মার কাছে যাব।”

পণ্ডিত মেহজাবিনকে বলল। মেহজাবিন হেসে বলল, “আমিও এরকমই কিছু একটা ভেবেছিলাম। এই কথা শোনার জন্য আপনাকে না আনলেই হত।”

পণ্ডিত বলল, “আমি কি তবে এবার যেতে পারি?”

মেহজাবিন বলল, “না। স্বয়ং বাদশাহ আসবেন। আপনি প্রতীক্ষা করুন।”

পণ্ডিত চমকে উঠল।

মেহজাবিন বলল, “আপনি ওকে জিজ্ঞেস করুন ওর বাড়ি কোথায় ছিল?”

পণ্ডিত জিজ্ঞেস করল।

রাধা বলল, “জানি না। আমার বাবা গ্রামের মন্দিরের পূজারী ছিলেন।”

পণ্ডিত এবার ঈষৎ চমকে উঠে রাধাকে বলল, "তুমি ব্রাহ্মণকন্যা?"

রাধা বলল, "হ্যাঁ। আমাকে এক সেনা বলপূর্বক নিয়ে এসেছিল..." বাকি সব কথা রাধা পণ্ডিতকে বর্ণনা করে গেল।

পণ্ডিত বলল, "অত্যন্ত গর্হিত কাজ হয়েছে তোমার সঙ্গে। কিন্তু আমরা চাইলেই তো কিছু করতে পারব না মা। এ দেশ এখন এরাই চালাচ্ছে। আমাদের কোনও কথাই এরা শুনতে চাইবে না।"

মেহজাবিন অধৈর্য হয়ে বলল, "কী কথা বলছেন নিজেদের মধ্যে?"

পণ্ডিত চমকে উঠে বলল, "সেরকম কিছুই না। মেয়েটির বাড়ি কোথায় জানার চেষ্টা করছিলাম।"

মেহজাবিন বলল, "এত কথা বলার অনুমতি তো আপনাকে দেওয়া হয়নি। যেটুকু জানার সেটুকু জানুন। সবথেকে ভালো কথা, আপনি এখন একেবারে চুপ করে থাকুন। সম্রাট আসুন, তারপর যা কথা বলার উনিই বলবেন।"

পণ্ডিত আতঙ্কিত হয়ে বলল, "যা বলবেন।"

মেহজাবিন আর কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় বাদশাহের আগমনধ্বনি শোনা গেল।

২৪

বিকেল হয়েছে।

আদিত্য দুপুরে ঘুমাবার চেষ্টা করছিল। ঘুম এল না। ড্রয়িং রুমে ঝুমকি টিভি দেখছিল।

আদিত্য এসে বসল। ঝুমকি সোফায় আধশোয়া হয়ে হিন্দি সিনেমা দেখছিল।

আদিত্যকে দেখে বলল, “তুমি কিছু দেখবে?”

আদিত্য বলল, “না, তুই দেখ না। আমার ঘুম এল না। মাথায় একগাদা চিন্তা আসছে শুধু।”

ঝুমকি বলল, “খুব সমস্যা করে দিলাম বলো?”

আদিত্য বলল, “সমস্যা না ঠিক। দেখ আমার তো অফিস আছে। এখানে তোকে কদিন গার্ড দেব? আর তোর দিদির বুদ্ধিশুদ্ধি কোনও কালে হবে না। আমি যখন আসতে বলছি, নিশ্চয়ই কোনও কারণ আছে। সেটা বুঝবে না।”

ঝুমকি নখের দিকে তাকিয়ে বলল, “ও কী করবে বলো। আমার জন্য বাড়িতে এত বড়ো একটা সমস্যা তৈরি হয়ে গেল।”

আদিত্য বলল, “হুঁ। সে তো বুঝতেই পারছি। তবে ব্যাপারটাকে সমস্যা না ভেবে আমাদের এবার সলিউশনের দিকে যাওয়া উচিত। সমস্যা জিইয়ে রেখে কোনও পক্ষেরই কোনও লাভ হবে না।”

ঝুমকি বলল, “ও খুব ডেসপারেট, না?”

আদিত্য বলল, “হ্যাঁ। তোকে ভালোবাসে কি না বুঝতে পারছি না।”

ঝুমকি ম্লান হেসে বলল, “ধুস, ভালোবাসা না। গোটাটাই ইগো। কনভার্ট করতে চেয়েছিল, পারেনি। ব্যস। এর মানেই হল এবার ও মরিয়া হয়ে আমার ক্ষতি করতে চাইছে।”

আদিত্য রিমোটটা হাতে নিয়ে চ্যানেল চেঞ্জ করে খবরের চ্যানেল দিল। ব্রেকিং নিউজে দেখাচ্ছে রাজ্যে আবার ভিন ধর্মে বিয়ে করায় যুবতিকে নিখোঁজ করল যুবতির পরিবার। টিভিতে ঝুমকির মুখ দেখাচ্ছে।

আদিত্য আর ঝুমকি পরস্পর চমকে দুজনের মুখ দেখল। আদিত্য বলল, "প্রেস হয়ে গেল? এভাবে একপেশে খবর দেখাচ্ছে কেন?"

ঝুমকি অধৈর্য হয়ে বলল, "জানি না। কিন্তু দ্যাখো, এমনভাবে দেখাচ্ছে যেন আমার বাড়ির লোকই অপরাধী। ঘটনাটা তো পুরো উলটো আসলে!"

আদিত্য বলল, "এরকমই তো হয়। মিডিয়ার কাজই হল সোজা জিনিসকে বাঁকাভাবে ঘুরপথে দেখিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করা। তুই এসব নিয়ে বেশি ভাবিস না তো। ভুলে যা।"

ঝুমকি বলল, "কেন ভাবব না? আমার মুখ দেখিয়ে দিল কেন? এ আবার কী ধরনের অসভ্যতা?"

আদিত্য বলল, "খবরটাই তো এমনভাবে প্রেজেন্ট করছে ওরা। দাঁড়া, সুশোভনকে ফোন করি।"

আদিত্য ফোন নিয়ে সুশোভনকে ফোন করল।

সুশোভন ফোন ধরে বললেন, "কি রে, কখন ট্রিট দিবি জানাতে ফোন করলি?"

আদিত্য অবাক হয়ে বলল, “মানে?”

সুশোভন বললেন, “এই যে তোদের সবাইকে বারবার টিভিতে দেখাচ্ছে। সবই তো আমার দৌলতে!”

আদিত্য বলল, “ছাড় তো। আসল কথা বল। আমরা এবার কী করব?”

সুশোভন বললেন, “কী করব সেটা বলাই তো সবচেয়ে কঠিন ব্যাপার। উপরমহল থেকে ফোন আসা শুরু হয়েছে। তোরা নাকি আমার সহায়তায় ঝুমকিকে লুকিয়ে রেখেছিস। মারাত্মক ব্যাপার হয়ে গেছে। একদিকের কমিউনিটি থেকে হুমকি ফোন আসা শুরু হয়েছে। বুদ্ধিজীবীদের মোমবাতি মিছিল এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।”

আদিত্য বলল, “মোমবাতি মিছিলকে গুলি মারি। জামান সাহেবের সঙ্গে কথা হল?”

সুশোভন বললেন, “আমি এখনও কারও সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনা করিনি। কেসটা অনেক উপরের লেভেলে চলে গেছে। ন্যাশনাল মিডিয়া কভারেজ শুরু করে দিয়েছে। ঝুমকি কেন পালিয়েছে সেটা বলার থেকে এদের ঝুমকির উপর করা বাপের বাড়ির অত্যাচার নিয়ে আগ্রহ বেশি। তোর শ্বশুরবাড়িতে ঝুমকির খবরটা দিলি?”

আদিত্য বলল, "দেব কীভাবে? ওর বাবা ভীষণ রিজিড লোক। ওর মা, ওর বাবাকে ছাড়া আর কিছু বোঝে না। আমার বউয়ের তো কিছু বোঝার বুদ্ধিই নেই। আমি খবরটা দিলে উলটে তুলকালাম লেগে যাবে। এই নিয়ে এখন যত কম চর্চা করা যায় তত ভালো। ঝুমকির সেফ থাকাটা অনেক বেশি জরুরি এখন।"

সুশোভন বলল, "তুই চিন্তা করিস না। তোর বাড়ির সামনে সাদা পোশাকে পুলিশ থাকবে, আমি ব্যবস্থা করেছি।"

আদিত্য বলল, "কেউ বুঝবে না তো ওরা পুলিশ? জানলেই তো বিপদ।"

সুশোভন বলল, "কোনও বিপদ না। এ তো আর যন্তর মন্তর ঘর না যে আমরা কিছু বুঝতে পারব না? আমরা নজর রাখব। তোদের নিরাপত্তার ব্যাপারটা দেখব। চিন্তার কোনও কারণ নেই।"

আদিত্য বলল, "ঠিক আছে। রাখি এখন।"

ফোনটা রাখল আদিত্য। সোফায় ঝুমকি শুয়েছিল।

নিজেকে অসহ্য লজ্জায় রেখে আদিত্যর হঠাৎ করে ঝুমকির প্রতি প্রবল যৌন আকর্ষণ হল। পরক্ষণেই জিভ কাটল সে।

চরিত্র জিনিসটাই সুতোয় হাঁটার মতো।

একটু পিচ্ছিল রাস্তা হলেই সব গেল।

২৫

মেহজাবিন রাধাকে সাজিয়ে দিচ্ছিল।

বাদশাহ হারেমে আসবেন খানিকক্ষণ পরে। রাধা কাঠের পুতুলের মতো চুপ করে বসে ছিল।

মেহজাবিন নিজের মনে বকবক করে যাচ্ছিল, "এক মেয়ের জন্য বাদশাহ যা শুরু করেছেন, সেটা কি তাঁকে মানায়? হারেমের মেয়ে তো। বিবি বানাতে কী হয়েছিল? তা করবেন না। ওদিকে হাজার খোঁজখবর নিয়ে যাবেন। যত্তসব।"

রুকসানা এসে রাধাকে কয়েক সেকেন্ড মুগ্ধ চোখে দেখে মেহজাবিনকে বলল, "মেয়ে কিন্তু বহুত খুবসুরত, যাই বলো বিবি।"

মেহজাবিন খিঁচিয়ে উঠল, "খুবসুরত? শাহি হারেমে যেন আর খুবসুরত আওরত নেই? কাবুলের শাহ যাকে পাঠিয়েছেন, সে এই মেয়ের থেকে হাজার গুণে সুন্দর।"

রুকসানা রাধার কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে রাধাকে চমকে দিয়ে রাধার একটা স্তনে হাত দিয়ে বলল, "তা বললে হবে? এ মেয়ের যেন সব কিছু সুন্দর। সাধে বাদশাহ হারেমে এসে শুধু এর ঘরেই যাবেন?"

রাধা রুকসানার হাত সরিয়ে দিল।

মেহজাবিন বিরক্ত গলায় রুকসানাকে বকল, "কী শুরু করলি? হাতে সময় কম আর তোর বেত্তমিজি শুরু। বেশি ইচ্ছা করলে রাবেয়ার কাছে গিয়ে শো।"

রুকসানা ফিচেল হাসি হেসে বলল, "রাবেয়ার কাছে তুমি যাও। আমি তো এই মেয়ের কাছেই থাকব। চোখ দেখেছ? এই মেয়েকে নাচ শেখাও বিবি, বাদশাহ আরও খুশি হবেন।"

মেহজাবিন বলল, "হ্যাঁ রে, সব দায় তো আমার, আমি সাজিয়ে দেব। নাচ শিখিয়ে দেব। সাজিয়ে দেব, সব আমিই করি।"

রুকসানা ফলের রেকাবি থেকে একটা আঙুর তুলল। রাধার পেটে বুলিয়ে মুখে দিয়ে বলল, "তা শেখাবে। তুমিই তো নিয়ে এসেছিলে একে। তোমার তো একটা দায়িত্ব

আছে বিবিজান। তা সে ছেলের খবর কী, যে এ মেয়েকে বিয়ে করবে বলে নিয়ে এসেছিল?"

মেহজাবিন বলল, "গোঁসা করে চলে গেছে। তার মা তো রোজ কাঁদে, বলে ভুল হয়ে গেল রে মেহজাবিন। আমার ছেলেটা রাগ করে চলে গেল।"

রুকসানা ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, "তা রাগবেই তো। এ মেয়ে যার হাতছাড়া হয় সে রাগবে না?"

মেহজাবিন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "ও কথা বলে লাভ নেই। বাদশাহের কাছে এসে পড়েছে, বাদশাহই এখন এ মেয়ের সুখ দুঃখের সব কিছু ঠিক করে দেবেন।"

রুকসানা মুখ বাঁকাল, "আর পরের হপ্তায় নতুন মেয়ে এলে আমাদের মতো একেও দূর করে দেবেন। আশায় আশায় বসে থাকতে হবে কখন আসবেন হুজুর।"

মেহজাবিন বলল, "তোর ঘরে আসেন না, এমন কথা বলিস না। বাদশাহ তোকে যথেষ্ট পছন্দ করেন।"

রুকসানা মাথা নাড়ল, "করেন। অস্বীকার করব না। কিন্তু প্রথম যখন এসেছিলাম, তখন যা করতেন, এখন কি তাই করেন?"

মেহজাবিন কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় এক মেয়ে এসে দরজায় দাঁড়াল।

মেহজাবিন বলল, "কী হয়েছে?"

মেয়েটা উত্তর দিল না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

মেহজাবিন রুকসানার দিকে তাকিয়ে বলল, "তুই এর চুলে ধূপটা দে, আমি আসছি।"

রুকসানা অবাক হয়ে বলল, "কে গো বিবিজান ও? হারেমে আগে দেখিনি তো।"

মেহজাবিন বলল, "আমি দেখেছি। তুই ওকে দেখ।"

মেহজাবিন পালঙ্ক থেকে নেমে বেরোল। রুকসানা সন্দেহের চোখে সেদিকে তাকিয়ে রাধার চুলে হাত বুলিয়ে বলল, "আহা, কী সুন্দর গোছ। ওহ, তুই তো আমার ভাষা বুঝবি না। তোর সঙ্গে কথা বলে কোনও লাভ নেই। বিবিজানকে বলতে হবে বাদশাহকে বলে তোর পুস্তু শেখার ব্যবস্থা করতে।"

রাধা কথা বলল না কোনও। একইরকম ভাবে বসে রইল।

মেহজাবিন ঘরটা থেকে বেরিয়ে চুপচাপ হাঁটতে থাকল। মেয়েটা মেহজাবিনের পিছু ছাড়ল না। নিজের ঘরে মেয়েটাকে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে মেহজাবিন সতর্ক চোখে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে বলল, "ভাইজান?"

মেয়েটা মাথা উপর নিচ করল।

মেহজাবিন হাত পেতে বলল, "দে।"

মেয়েটা একটা ছোট্ট বাক্স মেহজাবিনের হাতে দিল।

মেহজাবিন ত্রস্ত হাতে বাক্সটা নিয়ে দরজা খুলে দিল।

মেয়েটা চারদিকে তাকিয়ে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল।

মেহজাবিন দরজা বন্ধ করে বাক্সটা খুলল।

কামরান মির্জা পত্র পাঠিয়েছেন।

২৬

বিকেল হতেই বৃষ্টি নেমেছে। জানলাগুলো বন্ধ করতে হল।

ঝুমকি ড্রয়িং রুমের সোফাতেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

ব্যালকনিতে চেয়ারে বসে পায়ের ওপর পা তুলে সিগারেট খাচ্ছিল আদিত্য। বাড়ির সামনেটা বৃষ্টিতে ধুয়ে যাচ্ছে।

অনেক দিন পরের বৃষ্টি। শহরের উত্তাপ বেড়ে যাচ্ছিল। সংবাদপত্র আর চ্যানেলগুলো বৃষ্টি কবে আসবে, বৃষ্টি কবে আসবে বলে হেদিয়ে মরছিল। বৃষ্টি এসে সবাইকেই স্বস্তি দিল বলা বাহুল্য। ফোন বাজছিল। আদিত্য দেখল বাবা ফোন করছেন।

ধরল সে, "হ্যাঁ বলো।"

"কি রে বিল্টু, ওদিকে খবর কী রে?" বাবার উৎকণ্ঠিত গলা ভেসে এল।

আদিত্য অবাক হল, "কী খবর বলো তো?"

বাবা বললেন, "আরে ঝুমকিকে মনে হল টিভিতে দেখলাম। কী হচ্ছে এসব?"

আদিত্য মাথায় হাত দিল। সর্বশক্তিমান গণমাধ্যমের যুগে কোনও কিছুই আজকাল আর ধামাচাপা দেওয়া সম্ভব নয়। আলোর গতিতে সবার কাছে পৌঁছে যাচ্ছে সব খবর।

সে বলল, "হুঁ, দেখেছি। ওটা ঝুমকিই।"

"কী সর্বনাশ! এসব কী ঘটছে? জানাসনি কেন?"

আদিত্য বলল, "আমি নিজেই ঠিক করে জানি না বাবা। খোঁজ নিয়ে জানাব।"

"বেয়াইমশাইকে ফোন করব নাকি?"

আঁতকে উঠল আদিত্য, "না না, সেসবের কোনও প্রয়োজন নেই। ফোন করতে যেয়ো না আবার। ওঁরা এমনিতেই প্রচুর চিন্তায় আছেন। তোমার যদি কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে আমাকে কোরো, আমি খোঁজ নিয়ে রাখবখন।"

আদিত্যর বাবা আশ্বস্ত হয়ে বললেন, "হ্যাঁ জানাস। কী যে হচ্ছে কিছুই বলার নেই। তুই অফিসে?"

আদিত্য মিথ্যা করে বলল, "হ্যাঁ, অফিসে আছি। তোমায় পরে ফোন করছি বাবা।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ। রাখ এখন। কাজ কর।"

বাবা ব্যস্ত হয়ে ফোন কেটে দিলেন। আদিত্য ফোন রেখে বিরক্ত মুখে বাইরের দিকে তাকাল। আজকাল দায়িত্বজ্ঞানহীনতার আর-এক নাম মিডিয়া। খবর সম্পূর্ণভাবে না জেনে, নিজেদের মতো করে পরিবেশন করা এক জিনিস, সবথেকে বাজে ব্যাপার হল এরা এভাবে ঝুমকির মুখ দেখিয়ে দিল কী হিসেবে? একদিকের খবর পেয়ে অর্ধসত্য খবর পরিবেশন করাটা যে অপরাধ, সে বোধটুকু এদের নেই।

"চা খাবে?"

ঝুমকি কখন চলে এসেছে দেখেনি আদিত্য। বলল, "হ্যাঁ। কর। বাইরের দিকে আসিস না। আবার কে দেখে নেবে। তুই এখন ফেমাস হয়ে গেছিস।"

ঝুমকি বলল, "হুঁ। চা করছি।"

ভেতরের ঘরে গেল ঝুমকি। সিগারেটটা ফেলে আদিত্য নিচের রাস্তাটা দেখে নিল। বৃষ্টিপাতের ফলে শুনশান রাস্তা। সন্দেহজনক কাউকে দেখা গেল না। রিন্টুদের নেটওয়ার্ক শক্তিশালী বোঝাই যাচ্ছে। এরা শুধুমাত্র মেয়ে ভাগিয়ে নিয়ে গিয়েই ক্ষান্ত হয় না। তারপরের সমস্ত ফলাফলগুলো নিয়েও যথেষ্ট হোমওয়ার্ক করেই এগোয়, সেটা রিন্টুর ফোন থেকেই পরিষ্কার হয়ে গেছে।

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে আদিত্য রুমকিকে ফোন করল। রুমকি ধরল। বলল, "বলো।"

আদিত্য বলল, "বাড়িতে বাবা মাকে টিভি দেখিয়ো না। সমস্যা হতে পারে।"

রুমকি ধরা গলায় বলল, "টিভির পরোয়া করে যেন সব। গোটা পাড়ার লোক ভেঙে আসছে আমাদের বাড়িতে মজা দেখতে। টিভির খবর নিয়ে সেখানে রসালো আলোচনা হচ্ছে। বাড়ির বাইরে প্রেসের দুটো ভ্যান এসে দাঁড়িয়ে। বাবা একসময় রেগেমেগে বাইরে যাচ্ছিল। বহু কষ্টে আটকে রেখে দিতে পেরেছি। জানি না পারব নাকি।"

আদিত্য বলল, "প্রেসের কারও সঙ্গে কোনওরকম কথা বলার দরকার নেই। ওদের চাই ব্রেকিং নিউজ। কাউকে একটা ভিলেন খাড়া করে দিতে পারলেই হল। এই মুহূর্তে তোমাদের বাড়ি ভিলেন। মিডিয়ার ধারণা ঝুমকিকে তোমরাই লুকিয়ে রেখেছ।"

রুমকি কেঁদে ফেলল। আদিত্য বিরক্ত গলায় বলল, "সব কথায় যদি এভাবে কেঁদে ফ্যালো তাহলে তো কথা বলাই দায় হয়ে যায়।"

রুমকি কাঁদতে কাঁদতেই ঝাঁঝালো গলায় বলল, "তোমার আর কী! তোমার বোন তো পালায়নি! পালিয়েছে আমার বোন। আমরাই বুঝছি বাড়িতে কীসের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। নিজে তো দিব্যি ঠিক সময়ে কেটে পড়লে।"

আদিত্য বলল, "শোনো, এই সময় যদি আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে চাও, তো করতেই পারো। তবে আমার মনে হয় না, এটা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করার খুব একটা ভালো সময়। কী করবে, তোমাদের বাড়িতে কী সিদ্ধান্ত হয়েছে সেটা বলো।"

রুমকি বলল, "সিদ্ধান্তের কিছুই নেই। বাবা তো বলেই দিয়েছে ঝুমকি বাবার কাছে মরে গেছে। কোনওভাবেই বাকি জীবনটা বাবা আর ঝুমকিকে মেনে নিতে পারবে না।"

আদিত্য দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "ঠিক আছে।"

রুমকি বলল, "তোমার বন্ধুকে বলো পুলিশ দিয়ে মিডিয়া তাড়াতে।"

আদিত্য বলল, "সেটা বলা সম্ভব না। মিডিয়াকে পুলিশও ভয় পায়।"

রুমকি বলল, "সবকটা চ্যানেলে আমাদের বিরুদ্ধে এমনভাবে বলছে যেন আমার বাবা বাঘ বা ভাল্লুক! পালানোর আগে আমরা জানতামও না ঝুমকি কার সঙ্গে পালিয়েছে, সে হিন্দু না মুসলিম। এখন কী হিসেবে বাবাকে ভিলেন করা হচ্ছে বলো তো?"

আদিত্য বলল, "দ্যাখো, মিডিয়া মানেই তাই। তিলকে তাল করা। এই মুহূর্তে টিভি না দেখে নিজেদের মধ্যে সময় কাটাও বরং।"

রুমকি ভেঙে পড়া গলায় বলল, "জানি না কী করব।"

আদিত্য উত্তর দিল না। চুপ করে থাকল।

২৭

সুশোভনের উপরওয়ালা মিত্রসাহেব গম্ভীর মুখে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন। সুশোভনও কোনও কথা বলছিলেন না।

চুপ করে বসে ছিলেন।

খানিকক্ষণ পরে নীরবতা ভঙ্গ করে মিত্র বললেন, "ব্যাপারটা ছড়াচ্ছে সুশোভন। উপর থেকে ফোন এসে গেছে।"

সুশোভন বললেন, "কতটা উপর?"

মিত্র বললেন, "মাঝারি উপর। আরও উপরের ফোন যে-কোনো সময় আসতেই পারে। সেনসিটিভ কেস যখন।"

সুশোভন মিত্রর দিকে তাকিয়ে বললেন, "জামান সাহেব কেসটা পুরোটা জানেন স্যার।"

মিত্র বললেন, “জানি তো, সে তো আমিও জানি। সমস্যা সেখানে হবে না। সমস্যা বাধাবে মিডিয়া। ওদের কাজটাই তো তাই। তোমার বন্ধুর শ্বশুরবাড়িতে সিকিউরিটি দেওয়া নিয়েও ইস্যু তৈরি করে দিয়েছে।”

সুশোভন বললেন, “স্যার, প্রথমত ওঁরা কোনওরকম ইনফ্লুয়েনশিয়াল মানুষ নন, দ্বিতীয়ত, ওঁদের বাড়িতে হুমকি দেওয়া হয়েছিল। আমি আপনাকে জানিয়েই ব্যাপারটা করেছিলাম।”

মিত্র চিন্তিত মুখে মাথা নেড়ে বললেন, “মানবিকতার খাতিরে স্টেপটা নিতেই হত। কিন্তু সমস্যা হল, এক্ষেত্রে যখনই পলিটিক্যাল লোকজন ইনভলভ হবে, ব্যাপারটা একটু একটু করে উপরে যেতে যেতে একবারে উপরে চলে যাবে, তখন ঠিক কী হবে, সেটা নিয়েই আমার চিন্তা হচ্ছে। ওদের পাড়ার লোকেরা কী বলছে?”

সুশোভন বললেন, “ওদের ফরে আছে স্যার। কিন্তু যদি এই পার্টি, লরি ইত্যাদিতে আর্মস সহ লোক নিয়ে গিয়ে হামলা করে, তখন কী হবে, সেটা তো বলা যাচ্ছে না। শান্তিপ্রিয় লোকজন, অত দূর যে ব্যাপারটা গড়াতে পারে, সেসবের প্রিপারেশন ও পাড়ার লোকের থাকবে না।”

মিত্র খানিকটা চমকে গিয়ে বললেন, "করতেই পারে। ঝামেলা না করার কিছু নেই। এসব ব্যাপার অত্যন্ত সেনসিটিভ। শোনো সুশোভন, ওই এলাকার এক কিলোমিটার রেডিয়াসে টহলদারি বাড়িয়ে দাও। আমি ব্যাপারটা নিয়ে বেশ টেনশনে পড়লাম। কে জানে, কাল হয়তো এর জন্যই আমার মুন্ডু চাই বলে মিছিল বেরিয়ে গেল। সমস্যা হল, আজকাল সোশ্যাল মিডিয়া, মিডিয়া ইত্যাদিতে কোনওরকম যুক্তি প্রমাণ ছাড়াই মব জাস্টিস হয়ে যাচ্ছে। মানুষ নিজেরাই ঠিক করে নিচ্ছে কে ঠিক, আর কে ভুল। তিন-চারটে চ্যানেল থেকে ক্রমাগত আমাকে ফোন করে যাচ্ছে, আমি রেগেমেগে ফোন অফ করে দিয়েছি। তোমায় কেউ ফোন করেছিল?"

সুশোভন বললেন, "হ্যাঁ, মানালি করেছিলেন।"

মিত্র পেপারওয়েট হাতে নিয়ে গম্ভীর মুখে বললেন, "ব্যাপারটা বেশি দূর গড়াতে দেওয়া যাবে না। মেয়েটি, মানে তোমার বন্ধুর শালি, সেফ আছে তো?"

সুশোভন বললেন, "হ্যাঁ স্যার।"

মিত্র বললেন, "এই মুহূর্তে মেয়েটাকে জাস্টিস দেওয়া সম্ভব না হয়তো। কিন্তু সেফটি দেওয়াই যায়। তোমার বন্ধু, কী নাম বললে যেন...?"

সুশোভন বললেন, "আদিত্য, স্যার।"

মিত্র বললেন, “রাইট, আদিত্য। আদিত্যর সঙ্গে কন্টিনিউয়াস কন্ট্যাক্ট রেখে চলো। আর আমাকে আপডেট দিয়ে যেয়ো। যে-কোনো সময় উনি ফোন করতে পারেন, বুঝতেই পারছ।”

সুশোভন উঠলেন, “রাইট স্যার।”

মিত্র গম্ভীর মুখে বসে রইলেন।

মিত্রসাহেবের চেম্বার থেকে বেরিয়ে সুশোভন নিজের টেবিলে এসে বসলেন।

শহরে সন্ধে নেমেছে। যদিও কর্মব্যস্ততা বিন্দুমাত্র কমেনি তাঁর অফিসে।

মাথা ধরেছিল। সুশোভন চা আনালেন। বেশ সময় নিয়ে চা শেষ করছিলেন, দেখলেন আদিত্য ফোন করছে। ধরলেন তিনি, “বল। খানিক আগেই তো কথা হল। আবার কিছু হল নাকি?”

আদিত্য থমথমে গলায় বলল, “ফেসবুকে ঝুমকির ছবি দিয়ে একটা পোস্ট ভাইরাল হয়েছে। ওর বাড়ির লোক ভিনধর্মে বিয়ে মানেনি বলে ঝুমকিকে লুকিয়ে রেখেছে।

ব্যাপারটা তো পুরো উলটো ভাবে মানুষের কাছে পৌঁছোচ্ছে। আমরা কি কিছুই করতে পারি না?"

সুশোভন একটু চুপ করে বলল, "বসের সঙ্গে এই সোশ্যাল মিডিয়া নিয়েই কথা হচ্ছিল। এই ব্যাপারটা যখন ওরা ওদের মতো করে ভাইরাল করছে, তখন ঝুমকিকে দিয়েও একটা পোস্ট করানো যেতে পারে যা যা ঘটেছে তার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে। সমস্যা হল, এর ফলে তোর শ্বশুরবাড়িতে হামলাটা অবশ্যম্ভাবী হয়ে যাবে। আমার মতে এই মুহূর্তে, কোনওরকম ইম্পালসিভ ডিসিশন নিস না। ধরে খেল। পাবলিক নিয়ে ভাবিস না, আজ এই কেসটা নিয়ে মাতবে, কাল ফুটবল বা ক্রিকেট নিয়ে লাফাতে শুরু করবে, এই কেসের দিকে ফিরেও তাকাবে না। আপাতত তোর শ্বশুরবাড়ির লোকজন আর তোর বাড়ি, এই দুটো ঠিকঠাক আমাদের নজরে থাকুক। বাকিটা নিয়ে ভাবিস না বেশি।"

আদিত্য বলল, "বেশ। আমার হয়েছে জ্বালা। বউ এখানে থাকলে সমস্যা হত না। সে গিয়ে বসে আছে বাপের বাড়ি। কী যে করি!"

সুশোভন খুক খুক করে হাসতে হাসতে বললেন, "দেখ কেমন লাগে। খুব তো বলতি চিরকুমার থাকবি। কেন বিয়ে করতে গেলি। এবার কেস খা।"

আদিত্য রেগে গেল, "ইয়ার্কি মারিস না। পারলে বাড়ি ফেরার সময় এ বাড়ি হয়ে যাস।"

সুশোভন বললেন, "ঠিক আছে। আমি ঠিক যাব। চাপ নিস না। নিশ্চিন্তে থাক।

২৮

বৃষ্টি থামেনি। ঝুমকি চা নিয়ে এসেছে।

আদিত্য অন্যমনস্কভাবে বসে ছিল। ঝুমকি কাপ এগিয়ে দিয়ে বলল, "এ নাও। দিদি কী বলছে?"

আদিত্য চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বলল, "তুই এই মালটাকে জোটালি কী করে বল তো?"

ঝুমকির মুখটা নিমেষে কালো হয়ে গেল।

বলল, "আগে তো বলেছি। আর বলতে ভাল্লাগছে না বিশ্বাস করো।"

আদিত্য একটু ইতস্তত করে বলল, "তুই কনসিভ করিসনি তো? সেক্ষেত্রে তো আর-এক প্রবলেম হবে।"

ঝুমকি ফ্যাকাশে মুখে তার দিকে তাকিয়ে বলল, "সেটা কী করে বোঝে?"

আদিত্য কড়া চোখে কয়েক সেকেন্ড ঝুমকির দিকে তাকিয়ে বলল, "ধরে নিলাম ছেলেটা তোর সাথে ভালোভাবেই বিহেভ করত। তারপরেও তুই কোনও দিন এসব সম্পর্কে ভাবিসনি?"

ঝুমকি বলল, "ব্যাপারগুলো এত তাড়াতাড়ি হয়ে গেছিল, আমি ভাবিওনি কোনও দিন। তা ছাড়া রিন্টু বরাবরই নরম স্বভাবের। কোনও দিন গায়ে হাতও দিত না সেভাবে..."

চুপ করে গেল ঝুমকি।

আদিত্য বিরক্ত মুখে বাইরের দিকে তাকিয়ে বৃষ্টি দেখতে দেখতে বলল, "তোকে এখানে রেখে দিলে ব্যাপারটা থিতিয়ে যাবে হয়তো, কিন্তু তুই যদি কনসিভ করে থাকিস, সেক্ষেত্রে আর-এক ক্যাচাল দেখা দেবে। তুই রেপ চার্জ আনতে পারিস, সেক্ষেত্রে অনেক হ্যাপা পোহাতে হবে। তোদের কনজারভেটিভ বাড়ির চৌকাঠ ডিঙিয়ে সেটা করতে পারবি? জীবনে আর বিয়েও না হতে পারে।"

ঝুমকি বলল, "কনজারভেটিভ বাড়ির চৌকাঠ ডিঙিয়ে নিউজ চ্যানেল তো খবরটা দেখিয়েই দিল। পাড়ার সবাই চেনে আমাকে। চেনাজানা সবাই জেনে গেছে। আর কী হবে? কিন্তু যদি জানোয়ারটা শাস্তি পায়, তার থেকে ভালো আর কিছু হয় না।"

আদিত্য চায়ের কাপে চুমুক দিল, "শুনতে ভালো লাগবে, দোষী শাস্তি পাবে। কিন্তু আমাদের দেশে ঠিক কতটা পথ পেরিয়ে একজন ধর্ষক শাস্তি পায়, সে সম্পর্কে তো সবাই জানে। নতুন করে বলার কিছু নেই। দেখ, এই মুহূর্তে দুটো রাস্তা খোলা আছে।"

ঝুমকি আদিত্যর দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

আদিত্য বলল, "এক, যেটা জামান সাহেব বললেন। অ্যাগ্রেসিভ অ্যাটিচিউড নেওয়া। তোকে প্রকাশ্যে এসে প্রেস কনফারেন্স করে এফআইআর দায়ের করা। সেক্ষেত্রে তোর লাইফ থ্রেট আসতে পারে, তোকে দুশ্চরিত্রা বলে দাগিয়ে দেওয়া হতে পারে, আরও অনেক কিছুই হতে পারে।

দুই, একেবারে লুকিয়ে থাকা। বাড়ির লোকদের সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করে চেন্নাই বা গুজরাটে তোদের যারা আত্মীয়স্বজন আছে তাদের বাড়ি গিয়ে ওদিকে কোনও প্রবাসী বাঙালি ছেলেকে সব লুকিয়ে বিয়ে করা। এবার তুই ঠিক কর কী করবি।"

ঝুমকি মাথা নিচু করে বলল, "আমি একটা বোঝা হয়ে গেছি সবার কাছে, তাই না?"

আদিত্য বলল, "তুই বাচ্চা মেয়ে, বোঝা হয়েছিস নাকি সেটা আমি বলার কেউ না, কিন্তু একটা কথা তুইও বুঝিস, এখন সময়টা মোটেও ভালো না আমাদের জন্য। তোর বাবা

রক্ষণশীল লোক। ওদিকে ছেলেটার বাড়ির লোক মোটেও সুবিধের না। সব সামলে চলা খুব কঠিন, খুব।"

ঝুমকি গোঁজ হয়ে থেকে বলল, "ও যদি আগে আমাকে বলত ও মুসলিম, তাহলে আমি ভেবে দেখতাম।"

আদিত্য বলল, "সেটা কোনও কথা না। হিন্দু মুসলিম বা অন্য যে-কোনো ধর্মে ভালোবাসা হতেই পারে। সমস্যাটা হল ইচ্ছা করে সেটা লুকিয়ে রাখায়। এভাবে লুকিয়ে রাখার অর্থ হল কোনও দুরভিসন্ধি ছিল। সে যে কী ছিল, সেটা তো বোঝাই যাচ্ছে। যাই হোক, যদি কনসিভ করিস, কী করবি?"

ঝুমকি বলল, "ওর বাচ্চা আমি নেব না। মরে গেলেও নেব না। তোমার প্রেসে কেউ চেনা আছে?"

আদিত্য বলল, "না। সুশোভনের থাকতে পারে। কেন?"

ঝুমকি বলল, "আমি ব্যাপারটা নিয়ে লড়তে চাই। আমি যদি পিছিয়ে যাই, তাহলে নিজেকে কোনও দিন ক্ষমা করতে পারব না। তাতে যদি মরি তো মরব। এমনিতেই তো জীবনে যা হবার হয়েই গেল। এর থেকে মরে যাওয়াই তো ভালো।"

আদিত্য ঝুমকির দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বলল, “আজ রাতটা ভাব। কাল সকালে বলবি আমায়। তোর বাড়ির লোকের, আমাদের, সবার নিরাপত্তা জড়িয়ে আছে।”

ঝুমকি চুপ করে মেঝেতে বসে পড়ল।

#

রাত তিনটে। আদিত্য ঘুমাচ্ছিল।

দরজা নকের শব্দে উঠে বসল।

দরজা খুলে দেখল ঝুমকি দাঁড়িয়ে আছে।

আদিত্য বলল, “কী হল?”

ঝুমকি বলল, “আমি ভেবে নিয়েছি। তোমার ফোনটা দেবে? যা যা হয়েছে, সেটা ফেসবুকে লিখব। কোথায় আছি সেটা বলব না। তাহলে তো আর কারও নিরাপত্তায় কোনও সমস্যা দেখা দেবে না?”

আদিত্য ঘুমচোখে ঝুমকির দিকে তাকিয়ে বলল, “কাল সকালে করিস।”

ঝুমকি বলল, “না, এখনই দাও। এখনই করব।”

আদিত্য কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে দরজা ছেড়ে বলল, “টেবিলের ওপর আছে ফোনটা। পোস্ট করার আগে আমাকে দেখাবি।”

২৯

কাজ মিটিয়ে সুশোভনের পুলিশ কোয়ার্টারসে ফিরতে দেরি হয়ে গেছিল। ঘুমাতে ঘুমাতে রাত দেড়টা।

ভোর সাড়ে চারটের দিকে ফোনের রিঙের শব্দে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। এরকম অভ্যাস আছে তাঁর। প্রায়শই এভাবে ঘুম ভেঙে যায়। অভ্যস্ত হাতে নম্বর না দেখেই ফোনটা কানে দিলেন তিনি, “হ্যালো।”

“কাজটা ভালো হল কি স্যার?”

গলাটা বুঝতে পারলেন না সুশোভন। অবাক গলায় বললেন, “কে বলছেন?”

“এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলে হবে সাহেব? আমি ইজাজ মল্লিক বলছি। কাজটা কিন্তু আপনারা ভালো করলেন না। এর ফল ভালো হবে না।”

সুশোভন বললেন, "কোন কাজ? আমি কিছু জানি না।"

ওপাশ থেকে হাসির শব্দ ভেসে এল, "যা বলেছেন। নেতা আর পুলিশের কাজই হল কিছু না জানা। যাই হোক, মেয়েটিকে দিয়ে ফেসবুকে বয়ান দেওয়ানো হয়েছে। ওকে নাকি রেপ আর জোর করে কনভার্ট করার চেষ্টা করানো হয়েছে। এই মিথ্যার উত্তর পাবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে আপনাদের। চাকা জ্যাম করে দিলে সামলাতে পারবেন তো?"

সুশোভনের ঘুমটা ভেঙে গেল এবার পুরোপুরি। কড়া গলায় বললেন, "প্রথমত, মেয়েটি আমার কাস্টডিতে নেই। দ্বিতীয়ত, মেয়েটি যদি তার সঙ্গে যা ঘটেছে তার রিটেন কমপ্লেইন করে, তার ফলাফল যারা দোষী তাদের ভুগতেই হবে। আমি এই ব্যাপারে আপনার সঙ্গে আর কোনও কথা বলতে রাজি নই।"

ইজাজ মল্লিক বলল, "তা তো জানি অফিসার, আপনাকে বলতেও হবে না। আপনার ভালোর জন্যই বলেছিলাম, ব্যাপারটা আমাদের লেভেলে মিটে গেলেই ভালো হত। এবার সামলাতে পারবেন কি না দেখুন বাউন্সারগুলো। সবকটা বাউন্সারই কিন্তু বুকের ওপর দিয়েই আসবে। পারবেন তো অফিসার?"

সুশোভন বিরক্ত হয়ে ফোনটা কেটে দিলেন। লোকটা কিছুদিন আগেও পকেটমারি করে মার খেত। এখন বড়ো নেতা হয়ে গেছে। নেতা হওয়ার জন্য কোনওরকম পড়াশোনা লাগে না। কোয়ালিফিকেশন লাগে না। চিটিংবাজি, চুরিচামারি, খুন করতে জানতে পারলেও আজকাল নেতা হওয়া যায়।

তবে ইজাজ মল্লিকের গলার টোনটা তাঁর ভালো লাগল না। তিনি খাট থেকে নেমে খানিকটা পায়চারি করে আদিত্যকে ফোন করলেন। আদিত্যর ফোনটা একবার পুরো রিং হয়ে গেল। সুশোভন বুঝলেন আদিত্য ঘুমোচ্ছে। মোবাইলটা বন্ধ করতে যাবেন, এমন সময় দেখলেন আদিত্য কলব্যাক করছে। তিনি ফোন ধরতেই আদিত্য বলে উঠল, "খবরটা পেয়েছিস তবে?"

সুশোভন বললেন, "হ্যাঁ, রীতিমতো হুমকি আসা শুরু হয়েছে।"

আদিত্য বলল, "আজব! ঝুমকি তো এই জাস্ট কিছুক্ষণ আগে ফেসবুকে লিখল। এর মধ্যেই ওরা দেখে নিল? রাতে ঘুমায় না নাকি ওরা?"

সুশোভন বললেন, "যারা ক্রাইম করে, তারা কি অত সহজে রাত্তিরে ঘুমাতে পারে? আর ব্যাপারটা যেরকম স্পর্শকাতর হয়ে আছে, বুঝতেই পারছিস এত সহজে সব কিছু মিটে যাবে না। আচ্ছা, যেটা আমার জানার ছিল, মেয়েটা কি নিজে থেকেই ঠিক করল ঘটনাটা সোশ্যাল মিডিয়াতে দেবে বলে?"

আদিত্য বলল, "হ্যাঁ। মাঝরাতে ঘুম থেকে উঠিয়ে বলল, ফোনটা দিতে। ছটফট করছে অ্যাকচুয়ালি। একটা পাপবোধ তো আছেই বাড়ি থেকে পালিয়েছিল বলে, তার ওপর এভাবে ঘটে যাওয়া ঘটনা আর মিডিয়াতে তার সম্পূর্ণ মিসইন্টারপ্রিটেশন নিতে পারছিল না আর কি। কাঁহাতক আর লুকিয়ে লুকিয়ে থাকবে বল তো!"

সুশোভন বললেন, "চাকা জ্যাম করার ভয় দিচ্ছে। সম্ভবত কালকের দিনটা আমাদের জন্য খুব একটা সুখকর হবে না।"

আদিত্য বলল, "পুরো ব্যাপারটা হজম করে যাওয়াটাও তো কোনও কাজের কথা হবে না। তুই বললে আমি ঝুমকিকে দিয়ে স্ট্যাটাসটা সরিয়ে দিতে পারি, কিন্তু সেটা কি ঠিক হবে?"

সুশোভন বললেন, "না, সেটার দরকার নেই। এক কাজ করা যায়, স্ট্যাটাস দেওয়া মানে তো বয়ান দেওয়া। সেটা যে কারও কাস্টডিতে থেকেও দেওয়ানো যায়। তার থেকে ভালো হয় ঝুমকিকে বল সকালে ফেসবুক লাইভ করতে।"

আদিত্য বলল, "লাইভ করলে যদি লোকে বুঝে যায় ব্যাপারটা আমার বাড়ি থেকে হচ্ছে, তাহলে তো এখানেই হামলা হয়ে যাবে।"

সুশোভন একটু থমকে বললেন, “সেটা ঠিক। আচ্ছা, আপাতত স্ট্যাটাসটাই থাক। সেটার কী রিপার্কেশন হয় সেটা দেখে নি। তুই ঘুমিয়ে পড়। কাল দেখা যাবে যা হবে। গুড নাইট।”

আদিত্য “গুড নাইট” বলে ফোন রেখে দিল।

#

সুশোভন ফোন বন্ধ করে শুলেন। এপাশ ওপাশ করে ঘুম এল শেষরাতের (প্রথম ফোনের সময়ই ভোর সাড়ে চারটে বলা হয়েছে) দিকে। সকাল দশটা নাগাদ ফোন অন করে বাথরুমে গেছিলেন। বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেখলেন ফোন বেজে চলেছে।

দেখলেন অফিস থেকে ফোন আসছে, ধরলেন, “হ্যালো।”

“সুশোভন?”

সুশোভন গলাটা চিনলেন। ইন্সপেক্টর বিশ্বাস। বললেন, “হ্যাঁ, বলুন।”

“ফোন অফ রেখেছিলেন কেন?”

সুশোভন হাসলেন, “আর কী বলব, ফোনের জ্বালায় তো ঘুম মাথায় উঠেছিল। কেন, কী হয়েছে?”

“আপনার ট্রান্সফার অর্ডার এসেছে। সন্দেশখালিতে। ইমিডিয়েট পোস্টিং।”

সুশোভন চুপ করে ফোন হাতে দাঁড়িয়ে রইল।

৩০

সকাল আটটা। আদিত্যর শেষরাতের (সুশোভন ভোরে ফোন করেছে) দিকে ঘুম এসেছিল। ঘুম ভাঙল রুমকির ফোনে। ফোন ধরতেই ওপাশ থেকে রুমকির উত্তেজিত গলা ভেসে এল, “এই, উঠেছ?”

আদিত্য ঘুম জড়ানো গলায় বলল, “না, কী হয়েছে?”

রুমকি বলল, “আরে বোন ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়েছে। আমি তো ভাবতেই পারছি না ও এরকম একটা চক্রে জড়িয়ে পড়েছিল।”

রুমকি কেঁদে ফেলল।

আদিত্য বলল, “ওহ। ভাবতে পারোনি? তোমার বাবাকে দেখিয়েছ?”

রুমকি কাঁদতে কাঁদতেই বলল, "বাবা বোনকে নিয়ে কোনও কথা শুনতেই চাইছে না। তুমি একবার এসো না।"

আদিত্য শুয়ে ছিল। এবার বিরক্ত হয়ে খাটে উঠে বসে বলল, "কী ব্যাপার বলো তো? আমি কি অফিস ছেড়েই দেব? রোজ রোজ এভাবে অফিস কামাই করলে তো চাকরিটাই চলে যাবে। কী চাইছ?"

রুমকি রেগে গেল, "তা তো বলবেই। তোমার নিজের বোন হলে কী করতে? আমার বোন, আমার বাড়ির ব্যাপারে তো তোমার বিরক্তি আসবেই! থাক। তোমাকে কিচ্ছু করতে হবে না। আমার বোনটা মরুক বাঁচুক, আমাদের সংসারটা ভেসে যাক, তুমি অফিস করো, যাও। অফিসে গিয়ে বসে থাকো।"

ফোনটা কেটে দিল রুমকি।

আদিত্য কয়েক সেকেন্ড চুপ করে বসে ফেসবুক খুলল। ঝুমকি কাল তার ফোন থেকে লগ আউট করেনি। একগাদা কমেন্ট পড়েছে ঝুমকির স্ট্যাটাসে। দু ধর্মের মধ্যে লাঠালাঠি লেগে গেছে প্রায়। হিন্দুরা বলছে তারা জানত মুসলিম মানেই এরকম, আর মুসলিমরা ঝুমকির চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। তুলকালাম কাণ্ড চলছে। কয়েক সেকেন্ড কমেন্টগুলো দেখে আদিত্যর কান মাথা গরম হয়ে গেল। সে খাট থেকে নেমে

বাথরুম সেরে ড্রয়িং রুমে গিয়ে টিভি ছাড়ল। ঝুমকির ব্যাপারটা খবরে দেখাচ্ছে। ঝুমকির স্ট্যাটাসটা আসার আগে অবধি ব্যাপারটা একরকম ছিল, রিন্টুর দিকে সহানুভূতির ঝড় বইছিল, এখন ব্যাপারটা খানিকটা দুভাগে ভাগ হয়েছে। রিন্টুদের বাড়ি থেকে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে বলা হয়েছে ঝুমকির বাড়ির লোকই ঝুমকিকে গুম করে এখন জোর করে তাকে দিয়ে বয়ান লেখাচ্ছে।

আদিত্য কয়েক মিনিট টিভি দেখে চ্যানেল চেঞ্জ করে কার্টুন চালাল। দেখা যাচ্ছে না। সত্যি, খবরকে কীভাবে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে নাটকীয় করে তিল থেকে তাল করতে হয় তা এই চ্যানেলগুলোর থেকে শেখার আছে।

ঝুমকি মনে হয় সারারাত ঘুমোয়নি। শেষরাতে ঘুমিয়েছে। আদিত্য প্রথমে তৈরি হয়ে নিয়ে পরে গেস্ট রুমে গিয়ে নক করতে যাচ্ছিল, ফোনটা আবার বেজে উঠল।

আদিত্য নাম্বার না দেখেই ধরল। ওপ্রান্ত থেকে ভেসে এল, "দাদা, ব্যাপারটা হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে তো।"

রিন্টুর গলা।

আদিত্য সোফায় বসল। ঠান্ডা গলায় বলল, "কী যাচ্ছে হাতের বাইরে?"

রিন্টু হাসল, "বুঝতেই পারছেন দাদা কী বলতে চাইছি। আমার বিয়ে করা বউকে আপনারা লুকিয়ে রেখে ঠিক করছেন? এরপর তো বাড়িতে বোম পড়তে পারে, আমার আর কিছু হাত থাকবে না।"

আদিত্য বলল, "ফ্যালো না বোম, কে বারণ করেছে। তোমরা বোম ফেললেই বরং তোমাদের চরিত্র, উদ্দেশ্য সবই পরিষ্কার হয়ে যাবে। যে জিনিসটা তোমরা করতে চাইছ, যদি ভেবে থাকো করে পার পেয়ে যাবে, তাহলে ভুল ভাববে।"

রিন্টু বলল, "কী করতে চাইছি দাদা? গরিব মানুষ আর অন্য ধর্ম বলে আমি আমার ভালোবাসাকে পেতে পারি না?"

আদিত্য বলল, "একশোবার পেতে পারো, ধর্মের জন্য কোনও দিন কিছু আটকাবে না, কিন্তু ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধর্ষণ যে শাস্তির আওতায় পড়ে তা বোধহয় তুমি জানো না। তুমি শিক্ষিত তো, না একেবারেই গণ্ডমূর্খ?"

রিন্টু এবার রেগে বলল, "একদম মুখ সামলে কথা বলবি। নিজের বউয়ের সঙ্গে সেক্স করলে কবে থেকে সেটা রেপের আওতায় আসে রে মাদারচোদ? ভেবেছিস কী তোরা? যে জাহান্নামেই লুকিয়ে রাখিস ওকে, খুঁজে বের করে আমার ঘরে নিয়ে আসবই। চ্যালেঞ্জ দিলাম তোকে।"

আদিত্য বলল, "এ কি সিনেমা পেয়েছ ভাই? বিয়ে করা বউ? ধর্ম লুকিয়ে বিয়ে করা কোথাকার বিয়ে করা বরের কাজ হে? একটা কথা মনে রেখো, দেশে এখনও আইন আদালত আছে, তোমাদের কপালে অশেষ দুঃখ আছে, সমঝে যাও। নইলে..."

রিন্টু ফোন কেটে দিল।

আদিত্য উঠল। গেস্ট রুমের দরজায় নক করল।

ঝুমকি ঘুমচোখে দরজা খুলে তার দিকে তাকিয়ে বলল, "বেরোবে?"

আদিত্য বলল, "হ্যাঁ, যথারীতি তুই আবার আগুন লাগিয়ে দিয়েছিস চারদিকে।"

ঝুমকি আঁতকে উঠে বলল, "মানে? আমাদের বাড়ি ঠিক আছে তো?"

আদিত্য আশ্বস্ত করল "হ্যাঁ, সে ঠিক আছে। তবে তোর স্ট্যাটাসটা পড়ে তোর দিদির মন নরম হয়েছে। এবার মনে হয় তোর ব্যাপারটা বলা যাবে। তোর বাবাকে ম্যানেজ করতে পারলে আর কোনও চিন্তা নেই। ফ্রিজে কিছু খাবার আছে। ওগুলো খেয়ে সকালের খিদে মেটা। দুপুরে ভাত এনে দেব।"

ঝুমকি বলল, "অফিসে যাবে না আজকেও?"

আদিত্য বলল, "হ্যাঁ, চাকরিটা ছেড়েই দিতে হবে যা বুঝছি। তোর রোমিও ফোন করেছিল। খুব তড়পাচ্ছে।"

ঝুমকির মুখটা কঠিন হয়ে গেল। বলল, "ওকে কেউ মেরে ফেললে আমি সবথেকে বেশি খুশি হতাম। জানোয়ার একটা।"

৩১

মিত্র সাহেব চেম্বারে ছিলেন। সুশোভন নক করলেন।

মিত্র সাহেব বললেন, "কে?"

সুশোভন মুখ দেখালেন।

মিত্র সাহেব বললেন, "একটু পরে আসতে পারবে? কাজ ছিল এখন।"

সুশোভন বললেন, "দু মিনিট নেব স্যার। চলে যাব তারপর।"

মিত্র বললেন, "ওকে। এসো।"

সুশোভন চেম্বারে ঢুকলেন।

মিত্রসাহেব বললেন, "আমি জানি তুমি কী নিয়ে বলতে এসেছ। শকিং অর্ডার। কিন্তু কিছু করার নেই। উপরওয়ালার নির্দেশ এলে আমি অপারগ। তুমিও জানো কিছুদিন আগেই ডিএ নিয়ে আন্দোলন করতে গেছিল বলে পার্মানেন্ট পোস্টেড কয়েকজনকে এভাবেই ট্রান্সফার করা হয়েছিল।"

সুশোভন বললেন, "আমি সবটাই বুঝেছি স্যার। এবং এই নিয়ে আমার কিছুই বলার নেই।"

মিত্রসাহেব অবাক হয়ে বললেন, "তবে?"

সুশোভন বললেন, "আমি বলতে চাইছি আপনার সঙ্গে কাজ করে ভালো লাগল। নতুন টেরিটরিতে যাব। এরা আমাকে ট্রান্সফার করে ভালোই করেছে। আশা করছি খুব বেশিদিন আমাকে সন্দেশখালিতে রাখতে হবে না। ওখানেও তো একটা কমিউনাল টেনশন চলছে শুনছিলাম কদিন ধরে। গভর্নমেন্টের ভূমিকা ওখানেও সন্তোষজনক নয়।"

মিত্র সভয়ে সুশোভনের পেছনে কেউ আছে নাকি দেখে নিয়ে বললেন, "তুমি এসব কথা বলতে যেয়ো না এখন। একেবারেই বলতে যেয়ো না। তুমি রেগে আছ আমি জানি, কিন্তু

আমাদের চাকরিতে অ্যাঙ্গার ম্যানেজমেন্ট একটা আর্ট। দরকার হলে সাত-আট দিন ছুটি নিয়ে কোথাও ঘুরে এসো, এসে অর্ডারটা অ্যাক্সেপ্ট কোরো।"

সুশোভন হাসলেন, "না স্যার, অর্ডার নিয়ে ভয় পাবার তো কিছু নেই, সন্দেশখালিই পাঠান আর সুন্দরবন, মাস গেলে মাইনে পেলেই হবে। তবে একটা কথা ঠিক, ইজাজ মল্লিকরা কিন্তু স্যার সংখ্যায় বাড়ছে। আজ আমার বন্ধুর বাড়িতে হয়েছে, কাল আপনার বাড়িতেও হতে পারে। আপনারও মেয়ে আছে শুনেছি। একইভাবে একই ট্র্যাপ যদি আপনার বাড়িতে ওরা ফেলত এই হাস্যকর একটা ধর্মীয় কারণে, আপনি কী করতেন?"

মিত্র মাথা নাড়িয়ে বললেন, "ওহ, তুমি এই একবিংশ শতাব্দীতে এসে ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ সুশোভন। গ্রো আপ!"

সুশোভন বললেন, "আমি মাথা ঘামাচ্ছি না স্যার। একেবারেই না। কিন্তু আপনি পুরো ঘটনাটা আমার থেকে শুনেছেন। জামান সাহেব জানেন। কতগুলো সড়কছাপ ক্রিমিনাল একজন ভদ্রলোকের বাড়িতে হামলা করেছে বলে তাদের নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে। শুধু এই অপরাধে আমার বদলি হয়ে যাবে?"

মিত্র বললেন, "চা খাবে? দাঁড়াও চা বলছি।"

সুশোভন চুপ করে বসে রইলেন।

চা বলে মিত্র বললেন, "শোনো, আমিও জানি, তুমিও জানো, ঠিক কোন পরিস্থিতিতে আমাদের চাকরি করতে হয়। আমাদের বেসিক্যালি কিছু করার থাকে না। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় অর্ডার বের করতে হয়েছে। বুঝতেই পারছ... তুমি বুদ্ধিমান..."

সুশোভন বললেন, "মেয়েটা স্ট্যাটাস দিয়েছে স্যার। এবার তো ডিপার্টমেন্ট কিছু স্টেপ নেবে!"

মিত্র অস্বস্তিমাখা মুখে বললেন, "এই মুহূর্তে আমাদের কাছে ব্যাপারটা নিয়ে শুধু পরিস্থিতি দেখার নির্দেশ আছে। এবং এও বলা আছে মেয়েটিকে পেলে যেন কাস্টডিতে নেওয়া হয়।"

সুশোভন এবার উত্তেজিত হলেন। বললেন, "মেয়েটাকে কাস্টডিতে কেন নিতে হবে? কেন ছেলেটাকে ইমিডিয়েটলি অ্যারেস্ট করা হবে না? সবার আগে তো ফ্যাক্ট লুকিয়ে বিয়ে করার জন্য ফোর টুয়েন্টি চার্জ দেওয়া উচিত। তারপর কিডন্যাপিং, রেপ, সমস্ত চার্জ দেওয়া যায়!"

মিত্র বললেন, "রেপ চার্জ দেবে, প্রমাণ করতে হবে তো! তার জন্য মেয়েটার মেডিক্যাল চেক আপ করতে হবে। তুমি মেয়েটিকে জনসমক্ষে আনার ব্যবস্থা করো, মেডিকেল করাও, শুধুমাত্র অভিযোগের ভিত্তিতে কাউকে তো অ্যারেস্ট করা যায় না!"

সুশোভন বললেন, "আর কতগুলো লুম্পেন শহরে দাপিয়ে বেড়াবে, ডিপার্টমেন্ট থেকে তাদের কিচ্ছু করা হবে না, এটা কোথায় লেখা আছে স্যার?"

চা এল। মিত্র সুশোভনকে বললেন, "চা নাও। তুমি এক্সাইটেড হয়ে যাচ্ছ। পারসোনালি নিয়ে নিচ্ছ কেন? আমি আছি তো এখানে। আমি দেখব মেয়েটি যেন জাস্টিস পায়। তোমাকে কথা দিচ্ছি। তুমি নিশ্চিন্তে থাকো।"

সুশোভন গুম হয়ে বসে রইলেন।

৩২

ঝুমকিকে ঘরের ভেতরেই রেখে বাইরে থেকে দরজায় তালা দিল আদিত্য। ঝুমকিকে বলে দিয়েছে বারান্দায় না যেতে। বাইরের কেউ যদি ঘুণাক্ষরেও বুঝে যায় ঘরের ভেতরে কেউ আছে, তাহলে আর-এক সমস্যা হতে পারে।

গ্যারেজ থেকে গাড়িটা বের করে রাস্তায় নামাতে আদিত্য দেখল একটা টাটা সুমোতে কয়েকটা ছেলে তাকে তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ করছে। আদিত্য চারপাশে দেখল। দিনের আলো। পাড়ায় যথেষ্ট লোকজনও আছে।

সে নিজের গাড়িটা স্টার্ট করে খানিকটা এগোতে বুঝতে পারল সুমোটা তাকে ফলো করা শুরু করেছে।

সে সবে গাড়ি চালানো শুরু করেছে। অনেকটাই অ্যালার্ট হয়ে চালাতে হয়।

এই ছেলেগুলো রিন্টুদের বাড়িতে ছিল সম্ভবত। চোয়াড়ে মার্কা। রুবির জ্যামে গাড়ি দাঁড়ালে লুকিং গ্লাসে দেখল গাড়িটা একটা গাড়ি পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। আদিত্য ফোনটা বের করে সুশোভনকে ফোন করল। একটা রিং হতেই সুশোভন ফোন ধরলেন, "বল।"

আদিত্য বলল, "একটা সুমো ফলো করছে।"

সুশোভন বললেন, "একটা কাজ কর, তিলজলা থানায় গাড়ি ভিড়িয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়া। সুমো কেটে যাবে।"

আদিত্য বলল, "যদি তারপরেও না কাটে?"

সুশোভন বললেন, "ফোন করিস আমায়।"

আদিত্য বলল, "ঠিক আছে।"

লাল আলো সবুজ হতে সতর্ক হাতে আদিত্য গাড়ির গতি বাড়াল। সুমোটা দূরত্ব বজায় রেখে চলছে। সায়েন্স সিটির কাছে এসে আদিত্য সুমোটাকে ট্র্যাক করে সুশোভনের কথামতো থানায় ঢুকিয়ে দিল।

বেশ কয়েকজন পুলিশ বিরক্ত মুখে তার দিকে এগিয়ে এল।

আদিত্য সুশোভনের পরিচয় দিতে কেউ আর কিছু বলল না। সুমোটা থানার খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে। আদিত্য গাড়ির ভেতরে বসে মোবাইলটা হাতে নিল। গাড়ি থেকে নেমে সোজা সুমোটার দিকে হাঁটতে শুরু করল।

সুমোটা দাঁড়িয়ে ছিল। আদিত্য চুপ করে গাড়িটার কাছে গিয়ে একটা সিগারেট ধরাল।

গাড়ির ছেলেগুলো তাকে সন্দেহজনক দৃষ্টিতে দেখছে। ওরা ভাবতে পারেনি আদিত্য তাদের কাছে চলে আসবে। কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না।

আদিত্য ছেলেগুলোর দিকে বেশ কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে রিন্টুর নম্বরে ফোন করল। একবার রিং হতেই রিন্টু ধরল, “হ্যালো।”

আদিত্য ছেলেগুলোকে শুনিয়ে শুনিয়ে রিন্টুকে বলল, "তোমার অনেক টাকা? একটা সুমোসুদ্ধ লোক পাঠিয়েছ আমাকে কড়কে দেওয়ার জন্য? এত ম্যানপাওয়ার নষ্ট করছ একটা লাভ জিহাদের জন্য? কাজ নেই? সিরিয়াসলি?"

ছেলেগুলো আদিত্যর দিকে কড়া চোখে তাকাচ্ছে এবার। আদিত্য একবার থানার দিকে আড়চোখে দেখে নিল। ঠিক করে নিয়েছে ছেলেগুলো কিছু করলেই থানায় ঢুকে যাবে। তারপর যা হবে দেখা যাবে।

রিন্টু বলল, "আমার বউকে ছেড়ে দিন। আপনাদের আর কোনও জ্বালাতন হবে না। একদম উপরওয়ালার দিব্যি বলছি।"

আদিত্য সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বলল, "আমি তো উলটো কাজ করতে এলাম। আমাদের বাড়ির মেয়েকে গুম করে এখন সিন ক্রিয়েট করছ বলে তোমার এগেনস্টে চার্জ আনতে এসেছি থানায়।"

ওপাশটা স্তব্ধ হতেই আদিত্য ফোনটা কেটে দিল। রিন্টু ফোন করা শুরু করেছে। আদিত্য ধরল না ফোনটা। সুমোর ছেলেগুলোর দিকে তাকিয়ে হিন্দিতে বলল, "কাম কাজ কিছুই করো না তোমরা? সারাদিন এদিক সেদিক গুন্ডাগিরি করে কত টাকা কামাই হয়?"

ড্রাইভারের পাশে যে ছেলেটা বসেছিল সে ড্রাইভারকে কিছু একটা বলল। সুমোটা স্টার্ট নিয়ে বেরিয়ে গেল।

আদিত্য সেদিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে নিজের গাড়িতে গিয়ে বসল। গাড়িটা স্টার্ট নিতে গিয়েও নিল না। ফোন বের করে ঝুমকির ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খুলল। বেশ কয়েকজন বন্ধু ঝুমকিকে মেসেজ করেছে। অনধিকার চর্চা জেনেও আদিত্য মেসেজগুলো পড়তে শুরু করল। তিতলি নামে একটা মেয়ের মেসেজে এসে থমকে গেল আদিত্য। ঝুমকিকে লিখেছে, "কাজটা ভালো করলি না ঝুমকি। সমস্যা হতে পারে।"

আদিত্য তিতলির প্রোফাইল খুলল। ঝুমকি মেয়েটার সব প্রোফাইল পিকচারেই লাইক করে। অনেক চ্যাটও হয়েছে দেখা যাচ্ছে।

কয়েক সেকেন্ড ঠোঁট কামড়ে বসে থেকে আদিত্য তিতলিকে মেসেজ করল, "আমার ফোনে সব নাম্বার উড়ে গেছে। তোর নাম্বারটা একটু দে তো।"

তিতলি অনলাইনই ছিল। নিজের নাম্বারটা দিয়ে লিখল, "কোথায় তুই? কী করছিস? রিন্টুদাকে ফোন কর শিগগির! এসব কী করছিস তুই?"

আদিত্য ব্রাউজার বন্ধ করে তিতলিকে ফোন করল।

একটা রিঙেই ধরল তিতলি, "হ্যালো।"

আদিত্য খানিকটা ঝোঁকের মাথাতেই ফোনটা করেছিল। কী বলবে বুঝতে না পেরে বলল, "অর্ণব আছে?"

তিতলি "রং নাম্বার" বলে ফোনটা কেটে দিল।

আদিত্য ঠোঁট কামড়াল। ঝোঁকের মাথায় ফোনটা তার করা উচিত হয়নি। সে গাড়ি স্টার্ট দিয়ে শ্বশুরবাড়ির উদ্দেশে রওনা দিল।

উলটোডাঙার জ্যামের সুবাদে পৌঁছোতে দেরি হল।

আদিত্য পৌঁছে দেখল বাড়ি থেকে সিকিউরিটি তুলে নিয়েছে।

অবাক হয়ে সুশোভনকে ফোন করল। সুশোভন বললেন, "বল রে।"

আদিত্য বলল, "সিকিউরিটি তুলে নিয়েছে রে।"

সুশোভন হেসে বললেন, "সঙ্গে আমাকেও। ট্রান্সফার করে দিয়েছে, সন্দেশখালি!"

আদিত্য বলল, “সে কী! এবার কী হবে?”

সুশোভন বললেন, “কী আর হবে? লড়াইটা কঠিন হবে। জামান সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ করিস। ভদ্রলোক নিশ্চয়ই কিছু একটা হেল্প করবেন।”

আদিত্য মাথায় হাত দিল। রুমকি গাড়ির শব্দ শুনেছিল। বাইরে বেরিয়ে দেখল আদিত্য ফোনে কথা বলছে। তাকে দেখে এগিয়ে এসে বলল, “সিকিউরিটি তুলে নিয়েছে, দেখেছ? সুশোভনকে ফোন করো না!”

আদিত্য রুমকিকে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে চুপ করতে বলে সুশোভনকে বলল, “জামান সাহেবের নাম্বারটা পাঠা একবার। হারিয়েছি মনে হয়।”

সুশোভন বললেন, “পাঠাচ্ছি। আর শোন, ঝুমকিকে এখনও সামনে আনার সময় হয়নি। বি কেয়ারফুল।”

আদিত্য আড়চোখে রুমকির দিকে তাকিয়ে সুশোভনকে বলল, “আচ্ছা। থ্যাংকিউ রে।”

৩৩

সন্ধেবেলা।

ইজাজ মল্লিক গম্ভীর মুখে বসে ছিলেন। রিন্টু ঘরে ঢুকল।

ইজাজ বললেন, “মেয়েটার কোনও খোঁজ পেলি?”

রিন্টু মাথা নাড়ল।

ইজাজ বিরক্ত বললেন, “তোদের আর কীভাবে শেখাতে হবে বল তো? মেয়েটাকে নিয়ে ঘুরে এসে, বাঁধিয়ে দেওয়ার পর যা ইচ্ছা করতে পারতিস! শুরুতেই এত জোরাজুরি করার কী ছিল? এখন ফেসবুক এসে গেছে, শুধু মিডিয়া সব কাজ করতে পারে না। মানুষ চাইলে ফেসবুক ব্যবহার করে মিডিয়ার সঙ্গে পাঙ্গা নিয়ে নিতে পারে। যেটা মেয়েটা নিচ্ছে।”

রিন্টু বলল, “আমি বুঝতে পারিনি ধানবাদ থেকে ওভাবে পালিয়ে যেতে পারবে।”

ইজাজ রেগে গেলেন, বললেন, “ধানবাদেই কেন করার দরকার ছিল? আদৌ করারই বা কী দরকার ছিল? ওর পেটে যে বাচ্চা হত সে হিন্দু হত?”

রিন্টু চুপ করে রইল।

ইজাজ বলল, "মিডিয়া পর্যন্ত এখন ভাগ হয়ে গেছে। হিন্দুদের দল নড়েচড়ে বসেছে। ওরা ইস্যু করবে এবার এটাকে নিয়ে। আমি একা কত করব?"

রিন্টু বলল, "ওকে খুঁজে পেলে আপনার কাজ হবে তো?"

ইজাজের চোয়াল শক্ত হল, "হ্যাঁ। কোথায় যেতে পারে?"

রিন্টু বলল, "দিল্লি যেতে পারে। উত্তরপ্রদেশের কোনও শহরে গিয়ে লুকোতে পারে। কলকাতাতেও আসতে পারে। আবার ধানবাদেও লুকিয়ে থাকতে পারে।"

ইজাজ বললেন, "যেখানেই গিয়ে থাকুক, ওকে বের কর। যে গর্তে লুকিয়ে থাকুক। ওর সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করা মানেই বিপদ। আমি একটা চ্যানেলকে বলে দিয়েছি, মেয়েটা যে বাড়ির চাপে মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে গেছে সেটা প্রচার করার জন্য। কিন্তু তাতে বালির বাঁধ দেওয়া হবে। ও আবার কিছু লিখলে সেটা ঢাকা পড়ে যাবার চান্স প্রবল।"

রিন্টু চিন্তিত মুখে বসে রইল।

ইজাজ মল্লিক বললেন, "এভাবে বসে থাকবি না। ছেলেদের বল মেয়েটার বাড়ির লোককে চমকে রাখতে। সেটা করছিস?"

রিন্টু বলল, “প্রতিরোধ আসছে। পাড়ার লোক একজোট হয়েছে। আমাদের ছেলেরা একবার মার খেয়ে গেলে ঝামেলা হয়ে যেতে পারে। বড়ো ফোর্স চাই যারা এলাকায় গিয়ে বোমবাজি করে আসতে পারবে। আজ মাঝরাতে হলে ভালো। সেটা হলে ওরা ঘরে ঢুকে যাবে। তখন ওদের ওপর প্রেশার ক্রিয়েট করা সহজ হবে।”

ইজাজ কয়েক সেকেন্ড রিন্টুর দিকে তাকিয়ে ফোন বের করে একটা নাম্বারে ফোন করলেন। রিং হতেই ওপাশ থেকে ফোন রিসিভ হল। ইজাজ বললেন, “আলম? এই ঘরে আয়।”

মিনিটখানেক পরে একজন লম্বাচওড়া লোক ঢুকল ঘরে। ইজাজ বললেন, “নর্থে, একটা পাড়ায় আজ রাতে বেশ কিছু বোম ফেলে আসতে হবে। পুলিশ আমি ম্যানেজ করে নেব। পারবি?”

আলম বলল, “ঠিকানা দিন। এখনই করে আসি।”

ইজাজ ধমকালেন, “আমি এখন বলেছি? যখন বলেছি তখন করবি। রাত একটা থেকে দুটোর সময় যাবি। সারা পাড়া যখন ঘুমোবে তখন। পাড়া চমকাতে হবে শুধু। বাকিটা আমি বুঝে নেব।”

আলম মাথা নাড়ল।

রিন্টু বলল, "মেয়েটার দুলাভাই লোকটা টাইট আছে। ওকেও চমকানো দরকার। ওরই তো বন্ধু ওই পুলিশটা, যাকে ট্রান্সফার করা হল।"

ইজাজ মুখে তাচ্ছিল্যের শব্দ করে বললেন, "দুলাভাইকে দিয়ে কী করবি? তোদের এই হল সমস্যা। সব জায়গায় মাথা গরম করে কাজ হবে? বাপ মা বুড়ো বুড়ি। দুজন তো লোক। এক রাত বোমবাজি হলে ভয়ে পেচ্ছাপ করে দেবে।"

রিন্টু বলল, "তবু আপনি জায়গামতো বলে রাখুন, মেয়েটা আমার নামে রেপ চার্জ এনেছে ফেসবুকে। দেখার পর থেকে আমার মাথা কাজ করছে না।"

ইজাজ বলল, "আবেগঘন ভাষায় তুই একটা পোস্ট লেখ। কীভাবে ওর বাড়ি থেকে ওর ওপর চাপ দিয়ে তোদের পবিত্র প্রেমকে নষ্ট করতে চাইছে এই নিয়ে বড়ো করে কিছু লেখ।"

রিন্টু গম্ভীর হয়ে নখ খুঁটতে থাকল।

৩৪

“দেশভাগের ক্ষত ভারতবর্ষে সবথেকে বেশি হয়েছিল বাংলা আর পাঞ্জাবে। পাঞ্জাব যতটা সে জায়গা থেকে উঠে দাঁড়াতে পেরেছিল, পশ্চিমবঙ্গ সে জায়গা থেকে উঠে দাঁড়াতে পারেনি। ক্ষতটা থেকেই গেছে। যতই কমিউনিজম পশ্চিমবঙ্গে রাজত্ব করুক অনেক বছর ধরে, মানুষের ভেতর থেকে সে ক্ষতকে সরানো যায়নি। অবচেতন মনে সযত্নে লালিত পালিত হয়ে আছে আমরা ওরা, হিন্দু মুসলমান। নজরুল যতই বলে থাকুন মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম, হিন্দু মুসলমান, আদতে তা নয়। এই ক্ষত ছাইচাপা আগুনের মতো এ রাজ্যে বরাবরই ছিল। ধর্মনিরপেক্ষ দেশের শাসককে ধর্ম উদাসীন হতে হবে। ভোটের রাজনীতি আপনি করতেই পারেন। আপনি মাথায় কাপড় বেঁধে নামাজ পড়ে আসতেই পারেন ইফতারের সময়। কিন্তু তাতে মুসলমানদের প্রকৃত উপকার হবে না। মুসলমানদের দয়া কিংবা ঘৃণার চোখে দেখলে হবে না। তাঁরা ভিক্ষার দান চান না। তাঁদের জন্য চাই উপযুক্ত শিক্ষার পরিকাঠামো। এ রাজ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান কি কোনও কালেই ছিল না? শাসক যদি তাঁর মনোমতো ধর্মকে ব্যবহার করেন, ধর্মকে রাজনীতির জন্য ব্যবহার করেন, তার ফল মারাত্মক। সংখ্যালঘুকে ভুলভাবে তোষণ করে যাওয়া সংখ্যাগুরুকে ক্রুদ্ধ করে তোলে। একইসঙ্গে সংখ্যালঘুরাও যে খুব বেশি নিরাপদ বোধ করেন, সেটা ভাবলে বোকামি হবে। আবারও বলছি, তাঁরা কিন্তু দয়ার দান চান না। আপনি মুসলমান ক্রিমিনালদের ব্যবহার করবেন, আর সোশাল মিডিয়ায় কিছু ইন্টেলেকচুয়ালকে দিয়ে ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং করাবেন, এতে মুসলমানদের ভালো হচ্ছে না।

আমাদের সমস্যা আমাদের কোনও রাজা রামমোহন রায় নেই। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নেই। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে যে ধর্মের তত্ত্বের পরিবর্তন হয়, তা আমরা স্বীকার করি না। এর জন্য দায়ী অপর কেউ নয়। আমরাই দায়ী। ধর্মীয় গোঁড়ামি মাত্রাতিরিক্ত হয়ে গেলে সে ধর্ম মানুষের ভালোর জন্য আর থাকে না। হিংসা কিংবা দ্বেষ ছড়ানোর লক্ষ্যে কেউ ধর্মের গোড়াপত্তন করেন না। কয়েকশো বছর আগে আরব দেশে যে পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে ধর্মগ্রন্থ লেখা হয়েছিল, তার সঙ্গে এই ২০১৯-এ পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতির কোনও মিল নেই। মানুষকে একটা সময় বেঁচে থাকার জন্য লড়াই করতে হয়েছিল। যুগে যুগে যুদ্ধ হয়েছে। মানুষ মানুষকে মেরেছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ কমেছে। সভ্যতা মানেই তো তাই? অস্ত্র, যুদ্ধ ইত্যাদিকে দূরে সরিয়ে রেখে মানুষ যত পৃথিবীটাকে সুন্দর করে রাখবে, সভ্য সে তখন হবে। উন্নততম প্রযুক্তির পরমাণু বোমা যদি মানুষ মারার জন্যই তৈরি হয়ে থাকে, তা সভ্যতার কলঙ্ক।

যাই হোক, আমি খানিকটা প্রসঙ্গান্তরে চলে গিয়েছিলাম। আমার মূল বক্তব্যে ফিরে এসে বলি, রাজ্যে যদি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিস্থিতি তৈরি হয়, তার দায় আমরা কেউ এড়াতে পারব না। আমি আবারও বলি, পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্য, যেখানে অনুপ্রবেশ এখনও একটা সমস্যা, যেখানে দেশভাগের ক্ষত এখনও ছাইচাপা আগুনের মতো মানুষের অবচেতনে হানা দেয়, সেখানে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি আগুন নিয়ে খেলার সমান। আমাদের দুর্ভাগ্য, ধর্মনিরপেক্ষ দেশে ধর্ম নিয়ে রাজনীতিটাই হয় সবথেকে বেশি। উঁচু নিচু জাতি থেকে শুরু করে হিন্দু মুসলমান, এই সমস্ত ভেদাভেদ যতদিন না আমাদের দেশ থেকে সম্পূর্ণভাবে দূর হচ্ছে, ততদিন আমরা প্রকৃত সভ্য হতে পারব না।”

জামান সাহেব থামলেন। হলঘর ফেটে পড়ল হাততালিতে। বক্তব্যের বিষয় ছিল “সংখ্যালঘু এবং পশ্চিমবঙ্গ।” সুশোভন অপেক্ষা করছিলেন। সভা শেষ হওয়া অবধি অপেক্ষা করলেন। অনুষ্ঠান শেষ হলে জামান সাহেবের কাছে গিয়ে সুশোভন বললেন, “পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে জামান সাহেব। আমাকে ট্রান্সফার করে দেওয়া হল, ওদের বাড়ি থেকে সিকিউরিটিও সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।”

জামান সাহেব সুশোভনের দিকে তাকিয়ে বললেন, “স্বাভাবিক। লুম্পেনরা যখন প্রশাসনকে ব্যবহার করতে শুরু করবে, তখন এরকমই হবে।”

সুশোভন বললেন, “সন্দেশখালি জয়েন করতে যাব কাল। এর পরে কী করা যাবে?”

জামান বললেন, “আমি দেখছি। তুমি জয়েন করো। সব কিছু এত সহজে শেষ হতে দেওয়া যাবে না। মেয়েটির বাড়ির নিরাপত্তা যাতে থাকে সেটা আমি দেখে নেব। পুলিশের গাড়ি যাতে টহল দেয়, সেটা নিশ্চিত করা যাক। সেটা আমি লোকাল থানায় কথা বলে দেখে নেব। তোমার বন্ধুর নাম্বারটা আমায় দাও। আমি কথা বলি ওর সঙ্গে। একটা কংক্রিট স্টেপ নেওয়া দরকার। বেশি সময় নেই হাতে।”

সুশোভন আদিত্যর ফোন নাম্বার দিল।

জামান সাহেব মোবাইলে আদিত্যর নাম্বার সেভ করতে করতে বললেন, "লাভ জিহাদের নামে যে নোংরামি হচ্ছে, তা অবিলম্বে বন্ধ না করা গেলে এ রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থা কোন দিকে যাবে বুঝতে পারছ? সবাই বুঝতে পারছে, সমস্যা হল যাদের বোঝার কথা তারা বুঝতে পারছে না।"

সুশোভন কিছু বললেন না। গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

৩৫

তপন খানিকটা ভেঙেছেন, দেখে বুঝতে পারল আদিত্য। ঘরের মধ্যে অস্থির হয়ে পায়চারি করছিলেন। তাকে দেখে বললেন, "কোনও খবর পেলে বাবা?"

আদিত্য রুমকির দিকে তাকাল। রুমকির চেহারা ভাঙছে। কষ্ট হল হঠাৎ করে। মেয়েটার ওপর দিয়ে ঝড় যাচ্ছে। বাবা মা দুজনকেই সামলাচ্ছে।

রুমকি আদিত্যকে বলল, "বাবা ঝুমকিকে ক্ষমা করে দিয়েছে। পোস্টটা দেখেছে।"

আদিত্য সোফায় বসে রুমকিকে বলল, "জল দেবে একটু?"

রুমকি একটা জলের বোতল এনে আদিত্যকে দিল।

তপন পায়চারি থামিয়ে আদিত্যর সামনে বসলেন। বললেন, "নিজের ওপর ঘেন্না হচ্ছে। মেয়েটাকে কী না কী ভেবে নিয়েছি। আমার জন্যই, এত কড়া মনোভাবের জন্যই মেয়েটা বাড়ি থেকে পালাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বুঝতে পারছি। কী করা যায় বলো তো? মেয়েটা কোথায় থাকতে পারে? এইটুকু মেয়ে, এত কষ্ট সহ্য করেছে। ওরা বেচে-টেচে দেবে না তো?"

আদিত্য শ্বশুরের দিকে তাকাল। মনে মনে বলল, এই মনোভাবটা প্রথম থেকে থাকলে এত সমস্যা হত না। সুশোভনের কথা মাথায় এল তার। সে মাথা নাড়িয়ে বলল, "বলতে পারছি না। তবে মনে হচ্ছে ঝুমকি কোনও বন্ধুর কাছেই আছে।"

রুমকি বলল, "ওর সব বন্ধুকে ফোন করেছি। এমনকি কলেজের বন্ধুদের নাম্বার জোগাড় করেও ফোন করেছি। কোনও খবর পাচ্ছি না।"

আদিত্য কয়েক সেকেন্ড তপনের দিকে তাকিয়ে বলল, "ঝুমকি আমাদের বাড়িতে আছে।"

রুমকি চমকে আদিত্যর দিকে তাকাল।

তপন বড়ো বড়ো চোখে আদিত্যর দিকে তাকিয়ে বললেন, "আগে বলোনি কেন?"

আদিত্য বলল, "আপনারা সবাই এত রেগে ছিলেন তাই বলিনি। এখন রেগে নেই, তাই বললাম।"

রুমকি মাথায় হাত দিয়ে কয়েক সেকেন্ড বসে থেকে বলল, "এত ইম্পরট্যান্ট ব্যাপারটা তুমি আমাকে বললে না?"

আদিত্য বলল, "সুশোভন বারণ করেছিল। তোমরা যদি বেশি উত্তেজিত হয়ে কিছু করে ফ্যালো, তাই। কিন্তু এখন মনে হল বাবা মা যেভাবে ভেঙে পড়ছেন, তাতে ব্যাপারটা আর চেপে রাখার কোনও মানে হয় না।"

তপন আদিত্যর হাত ধরে প্রায় কেঁদে ফেললেন, "তুমি বেশ করেছ। ঠিক করেছ তুমি। আমার রাগের ওপরে আমার নিজেরই ভরসা নেই। সুস্থ আছে তো আমার মেয়েটা?"

আদিত্য বলল, "একদম।"

রুমকি দৌড়োতে দৌড়োতে ঘরের ভিতরে গিয়ে মাকে নিয়ে এল। মা কথাটা শুনে কেঁদে ফেললেন।

তপন এবার একটু উদ্বিগ্ন গলায় বললেন, "কিন্তু বাবা, ওই লুম্পেনগুলো যদি জানতে পারে ঝুমকি তোমার কাছে আছে, তাহলে তোমার নিরাপত্তা নিয়ে সমস্যা তৈরি হতে পারে।"

আদিত্য বলল, "এখন অন্য কিছু ভাবলে চলবে না। আমাদের সবাইকে মিলে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমরা কী করব। ব্যাপারটা নিয়ে এগোব, না ওকে বাইরের কোনও স্টেটে পাঠিয়ে ওখানে কারও সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেব।"

তপন মাথা নিচু করে কয়েক সেকেন্ড ভেবে বললেন, "মেয়েটাকে দেখতে ইচ্ছা করছে। অবশ্য এখন সেটা অসম্ভব। ওরা কোনওরকম ক্লু পেলে..." শিউরে উঠলেন তপন।

কিছুক্ষণ বসে তপন বললেন, "আমি গৃহদেবতার কাছে গেলাম। তোমরা বসো। ওঁকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আসি।"

তপন উঠলেন। তাঁর স্ত্রীও তাঁর সঙ্গে ঠাকুরঘরে রওনা দিলেন। রুমকি কয়েক সেকেন্ড চুপ করে বসে থেকে আদিত্যকে বলল, "তুমি আমাকে কেন বলোনি কিছু?"

আদিত্য বুঝল ঈশান কোণে মেঘ করেছে। সে বলল, "তোমাকে শুরুতেই বলেছিলাম ফিরতে। তুমি বলেছিলে বাড়িতে বাবা মাকে সামলাবে।"

রুমকি বলল, "একবার বলতে পারতে ও আমাদের ওখানে আছে। তাহলে আমি চলে যেতাম ঠিক। তোমরা একসঙ্গে আছ বাড়িতে?"

আদিত্য বিরক্ত চোখে রুমকির দিকে তাকিয়ে বলল, "তো কী করব? তুমি কি অন্য কিছু ইঙ্গিত করতে চাইছ? ভেবে নিয়ো আমি না থাকলে তোমার বোনের ঠিক কী হতে পারত।"

রুমকি বলল, "আমি তো সেরকম কিছু বলিনি! তোমার এই কথাটাই মনে হল কেন আমি কিছু ইঙ্গিত করছি? কী হয়েছে?"

আদিত্য বলল, "কিছু হয়নি। কী হতে পারে? মেয়েটা ভয়াবহ রকমের ভয় পেয়ে আছে। তোমাদের কাউকে ওর দরকার।"

রুমকি চুপ করল। কয়েক সেকেন্ড পরে আবার একই কথা বলল, "তোমার আমাকে বলা উচিত ছিল।"

আদিত্য দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

৩৬

"বোন কোন ঘরে শুচ্ছে?" রুমকি অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর অন্য দিকে তাকিয়ে আদিত্যকে জিজ্ঞেস করল।

আদিত্য রুমকির দিকে সরাসরি তাকিয়ে কড়া গলায় বলল, "মানে? তোমার ধারণা ঝুমকি আমার সঙ্গে ঘুমায়?"

রুমকি রাগি গলায় বলল, "আমি কি তোমাকে একবারও সেটা বলেছি? এইজন্যই মনে হয় বলে চোরের মন বোঁচকার দিকে।"

আদিত্য বলল, "বোঁচকার কিছু নেই। অফিস বন্ধ করে, সব বন্ধ করে তোমার ফ্যামিলির লোকের জন্য লেবার দিয়ে যাচ্ছি, আর তুমি যদি এখন এসব বলো তাহলে তো আর কিছু বলার নেই, তাই না?"

রুমকি এবার আদিত্যর দিকে তাকাল, "আমাকে প্রথমেই কথাটা বলা উচিত ছিল।"

আদিত্য বলল, "এ বাড়ির যা পরিস্থিতি ছিল, বলা কি সম্ভব ছিল? তোমাকে আমি বারবার আকারে ইঙ্গিতে বলেছি বাড়ি ফিরতে, তুমি বলেছ বাবা-মার সঙ্গে থাকবে। এখন তুমি আমার ঘাড়ে সমস্ত দোষ চাপাচ্ছ। তোমার বোন যে ছেলেটার সঙ্গে পালিয়েছিল, সে আমাকে থ্রেট করছে, তোমার বাড়িতে একটা গোটা মহল্লা এসে থ্রেট দিয়ে গেছে। এত

সব কিছুর পরে তুমি আমাকে সন্দেহ করছ। এত যদি সন্দেহ থাকে নিজের বোনকেই জিজ্ঞেস করতে পারো।"

রুমকি গুম হয়ে বসে রইল। আদিত্য বলল, "শোনো, আমার এত কৈফিয়ত দেওয়ার কোনও প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। তোমার যদি মনে হয়, বাড়ি যাবে, চলো। যদি মনে হয় থাকবে, থাকো। আমি আমার যেটা ভালো মনে হয় সেটা করেছি, করবও। মেয়েটা আমারও বোনেরই মতো। ওভাবে এসে আশ্রয় চেয়েছিল, আমি যদি তখন ওকে গার্ড না দিতাম, তাহলে ব্যাপারটা হাতের বাইরে চলে যেত। তোমাদের বাড়ির সম্মানের কথা ভেবে যা করার করেছি। সুশোভনকে বলেছি, প্রোটেকশনের ব্যবস্থা করেছি। এত সব কিছুর পরে তোমার মনে প্রশ্ন এল ঝুমকি কোন ঘরে শুয়েছে। মানে সিরিয়াসলি? কী করে পারো বলো তো?"

রুমকি গলা নিচু করে রাগি গলায় বলল, "চ্যাঁচাবে না। কোনওরকম সিন ক্রিয়েট করবে না। বাবা কিংবা মা শুনলে দুজনেই খারাপ ভাববে।"

আদিত্য বলল, "ভাবাই উচিত। তোমার মতো মেয়ে জন্ম দিলে খারাপ না ভাবার কিছু নেই।"

রুমকি বলল, "মানে? আমার মতো মেয়ে জন্ম দিল মানে? এখন আর আমাকে ভালো লাগছে না, তাই না?"

আদিত্য বলল, "আমি কি সেটা বলেছি? ভালো লাগা, না লাগার কারণগুলো তো তুমিই মাটি খুঁড়ে বের করছ। শোনো, তুমি রেডি হয়ে নাও। বাড়ি গিয়ে বোনকে সামলাও।"

রুমকি শক্ত হয়ে বসে বলল, "আমি কোথাও যাব না। নিজে সামলাচ্ছ যখন তুমিই সামলাও।"

আদিত্য এবার রাগল, বলল, "এটাই তোমার ফাইনাল ডিসিশান তো?"

রুমকি বলল, "হ্যাঁ। এটাই ফাইনাল ডিসিশান।"

আদিত্য কয়েক সেকেন্ড চুপ করে বসে থেকে উঠে বলল, "ঠিক আছে। আমিও তাহলে একটা কাজ করছি। ছেলেটাকে ফোন করে বলছি, তোমার বউকে নিয়ে যাও বাপু, এর জন্য আমার সংসারে অশান্তি লাগছে। তুমি ওকে নিয়ে গিয়ে কনভার্ট করো, নিকাহ করো, রেপ করো, তিন তালাক দাও, চার তালাক দাও, তাতে আমার কোনও কিছু যায় আসে না। নিয়ে গিয়ে যা খুশি করো। প্রয়োজন হলে মেরে পুঁতে দাও, আমার কোনও কিছু যায় আসে না।"

রুমকি আদিত্যর কথার উত্তর না দিয়ে চুপ করে বসে রইল।

আদিত্য রাগের মাথায় ঘর থেকে বেরিয়ে গাড়িতে গিয়ে বসে গাড়ি স্টার্ট দিল। রুমকি বেরোল না। খানিকটা যাওয়ার পর দেখল ফোন বাজছে। শ্বশুরমশাই ফোন করছেন। আদিত্যর রাগটা মাথা চাড়া দিল। গাড়ি রাস্তার বাঁদিকে পার্ক করে ফোন ধরল, "হ্যালো।"

তপন উদ্বিগ্ন গলায় বললেন, "তুমি বেরিয়ে গেলে কেন আদিত্য? আমরা তো কী করব কিছুই ঠিক হল না!"

আদিত্য ঠান্ডা গলায় বলল, "আপনার মেয়েকে জিজ্ঞেস করুন কী করবেন। আমাকে এর মধ্যে জড়াবেন না।"

ফোন রেখে আদিত্য গাড়ি স্টার্ট দিল।

৩৭

কাবুল থেকে তোতাপাখি পাঠানো হয়েছে বাদশাহকে। হুমায়ুন মুগ্ধ চোখে সকাল থেকে তাদেরকেই দেখে যাচ্ছেন। মাঝে মাঝেই বলছেন, "মারহাবা।"

বাদশাহকে যাঁরা চেনেন তাঁরা কেউই বিশেষ আশ্চর্য হচ্ছেন না। প্রায়শই এমন দিন আসে যেদিন বাদশাহ নিজের কক্ষে এরকম কোনও কিছু নিয়ে বসে থাকেন সারাক্ষণ।

বাদশাহর এক উজির এসে মাঝে মাঝেই উঁকিঝুঁকি মারছেন। হুমায়ুন বিরক্ত হলেন দেখে। নিশ্চয়ই কোনও কাজের কথা বলবে, নইলে আবার কোনও না কোনও সমস্যার কথা তুলবে। তিনি অনেকক্ষণ দেখার পরে একসময় রেগেমেগে নিরাপত্তারক্ষীকে হাঁক পেড়ে উজিরকে নিয়ে আসতে বললেন।

উজির নূর আলম শাহ সংকুচিত ভাবে এসে দাঁড়ালেন বাদশাহের কাছে। বাদশাহ বললেন, "কী ব্যাপার বলো তো? একটা দিনও কি তুমি আমাকে শান্তিতে থাকতে দেবে না? কী হল আবার?"

নূর আলম বললেন, "জাহাঁপনা, একটা ব্যাপার আমাকে কয়েক দিন ধরে বেশ চিন্তায় ফেলেছে, আমি কাকে বলব বুঝতেও পারছি না। বিশ্বাস করার মতো মানুষ তো খুব বেশি নেই এখানে।"

হুমায়ুন তাঁর উজিরের দিকে সস্নেহে তাকালেন। এই মানুষটির আনুগত্য প্রশ্নাতীত। নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে যার জন্য নূর আলম এত চিন্তিত হয়ে পড়েছেন।

বাদশাহ বললেন, "তোমার যখন কোনও কিছু মনে হয়েছে, তখন নিশ্চয়ই এর পিছনে কারণ আছেই। বলো নির্দ্বিধায়। আমি রেগে যাব না। বিরক্ত হয়েছিলাম বটে, কিন্তু পরে মনে হচ্ছে তুমি কিছু বলতে চাইছ। বলো।"

নূর আলম চারদিকে সন্তর্পণে তাকিয়ে বললেন, “হুজুর, আমার কাছে খবর আছে শাহি হারেমের মেহজাবিনের সঙ্গে আপনার ভাই কামরান মির্জার গোপন যোগাযোগ আছে। আমার সন্দেহ, উনি আপনাকে হত্যা করার কোনও পরিকল্পনা করছেন।”

বাদশাহ হো হো করে হেসে উঠে বললেন, “সে তো স্বাভাবিক ঘটনা। এতে এত উতলা হবার কী আছে? ভাই যদি ভাইকে ষড়যন্ত্র করে মেরে আনন্দ পায়, তাহলে পাবে। মরব নাহয়। কী আর এল গেল তাতে? এত চিন্তা কোরো না। তুমি বরং এই পাখিদের দেখো। হানাহানি, মারামারি, কাটাকাটির থেকে কত দূরে, কত নিশ্চিন্তে ওরা আছে। আমাদের মতো এত চিন্তা ওদের করতে হয় না। নিজের মাশুকার সঙ্গে সংসর্গে লিপ্ত অবস্থায় নিহত হবার কথাও এদের ভাবতে হয় না। এরা কত ভালো আছে না আলম?”

নূর আলম হাসার চেষ্টা করলেন, “বাদশাহ আমার কথাকে মনে হয় হালকাভাবে নিলেন। আপনার দীর্ঘ জীবনের প্রার্থনা করি জাহাঁপনা। আমাকে আসতে আজ্ঞা দিন।”

হুমায়ুন আবার হেসে বললেন, “এসো, বসো। পারস্যের সুলতান দমীহ পাঠিয়েছেন। পান করো। এসো।”

নূর আলম বসলেন। হুমায়ুন নিজের হাতে নূর আলমকে পান পাত্রে দমীহ ঢেলে দিয়ে পানপাত্রটি নূর আলমের হাতে এগিয়ে দিয়ে বললেন, “নাও।”

নূর আলম সসম্মানে বাদশাহের হাত থেকে পানপাত্রটি নিলেন।

বাদশাহ গলা তুললেন, "কে আছিস?"

একজন নিরাপত্তারক্ষী এগিয়ে এল।

বাদশাহ বললেন, "শাহি হারেম থেকে মেহজাবিন বিবিকে ডেকে নিয়ে এসো। এখনই।"

নিরাপত্তারক্ষী চলে গেল।

বাদশাহ বললেন, "তোমার কাছে কী প্রমাণ আছে তা আমার জানার প্রয়োজন নেই আলম, তোমার মুখের কথাই আমার জন্য সব। আমি তোমাকে বিশ্বাস করি।"

নূর আলম মাথা নুইয়ে বললেন, "আপনার মেহেরবানি জাহাঁপনা।"

বাদশাহ বললেন, "এই তোতাপাখিরা নাকি কথা বলতে পারে। তুমি এদের কথা বলা শেখাতে পারবে নূর?"

নূর আলম বললেন, "কোশিশ করতে পারি জাহাঁপনা। যদি পারি তবে খুদার অসীম মেহেরবানি হবে।"

বাদশাহ বললেন, “তোমার হাতে আমি এদের দায়িত্ব দিলাম আজ থেকে। এদের কথা বলা শেখাবে। কী কথা শেখাবে?”

নূর আলম বলতে যাচ্ছিলেন কিছু, এমন সময় নিরাপত্তারক্ষী মেহজাবিনকে নিয়ে প্রবেশ করল।

বাদশাহ নূর আলমকে ঠান্ডা গলায় বললেন, “ওর চোখ দুটো উপড়ে নাও নূর আলম। আমার সামনেই।”

মেহজাবিন আতঙ্কিত চোখে হুমায়ুনের দিকে তাকিয়ে বলল, “আমার কী গুনাহ হুজুর?”

হুমায়ুন বললেন, “কোনও গুনাহ নেই মেহজাবিন। আল্লাহর ইচ্ছা হয়েছে তোমার চোখ দুখানি রাখবেন না। আমি তো নিমিত্ত মাত্র।”

নূর আলম এক চুমুকে দমীহের পাত্র শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন।

৩৮

আদিত্যর মাথা বেশ গরম হয়ে ছিল।

সে খানিকক্ষণ গাড়ি চালিয়ে রাস্তার পাশের একটা ধাবায় গিয়ে বসল।

এতক্ষণ বুঝতে পারেনি, লোকজনকে খেতে দেখে তার খিদে পেয়ে গেল।

খাবার অর্ডার করতে গিয়ে মনে পড়ল ঝুমকি খায়নি এখনও। কয়েক সেকেন্ড থমকে থেকে "ধুত্তোর" বলে অর্ডার করে দিল। ঠিক করল ঝুমকির জন্য পার্সেল করে নিয়ে যাবে।

ফোন বাজছিল তার। দেখল সুশোভন ফোন করছে।

ধরল, "বল।"

"খবর কী ওদিকে?"

আদিত্য বলল, "খবর? খবর মজার। বউকে যেই বললাম ঝুমকি আমার কাছে আছে, ওমনি সন্দেহ করতে শুরু করে দিল।"

সুশোভন অবাক গলায় বললেন, "বলতে গেলি কেন? তোকে তো বারণ করেছিলাম।"

আদিত্য বলল, "কী করব? একটা পরিবারের লোকজনকে চোখের সামনে ভেঙে পড়তে দেখলে কি খুব ভালো লাগে? আমার মনে হয়েছিল, বলে ফেললে ওরা খানিকটা চাপমুক্ত হবে। ব্যাপারটা ব্যাকফায়ার করবে কী করে জানব? অবশ্য রুমকি বরাবরই এরকম। ছোটোখাটো ব্যাপারে পর্যন্ত সন্দেহ করবে।"

সুশোভন হেসে ফেললেন, "এইজন্যই বিয়ে করতে নেই। বিয়ে শব্দটার মধ্যেই ব আছে আর ব থেকে বরবাদিও শুরু হয়, বুঝলি?"

আদিত্য বলল, "ব থেকে ব-কারান্ত অসংখ্য গালাগালও শুরু হয়।"

সুশোভন হো হো করে হেসে উঠে বললেন, "একজ্যাক্টলি। আচ্ছা শোন, এই বিপ্লবী রিন্টুর সম্পর্কে বেশ খানিকটা ইনফরমেশন বের করতে পেরেছি। ইজাজ মল্লিকের চামচা এগুলো সব। তবে শিক্ষিত চামচা।"

আদিত্য বলল, "আর ভাই, এরা যত শিক্ষিতই হোক আসলে সব এক।"

সুশোভন সিরিয়াস হয়ে গিয়ে বললেন, "তুইও এভাবে কথা বলছিস কেন? একটা ঘটনা থেকে হঠাৎ এত জাজমেন্টাল হয়ে যাওয়ার তো কোনও কারণ নেই! তুই জামান সাহেবকে দেখিসনি? সবাই শুধুমাত্র লাভ জিহাদ করবে বলেই ভালোবাসে না রে ভাই। তবে হ্যাঁ, এটা ঠিক যে এই মুহূর্তে একটা চক্র সক্রিয় হয়ে উঠছে।"

আদিত্য তেতো গলায় বলল, “এই মুহূর্তে কী রে, আমি খিদিরপুরে একটা ফ্যামিলিকে চিনি, পাঁচ ভাইয়ের পাঁচজনই ব্রাহ্মণ মেয়ে বিয়ে করেছে। এরা হিন্দু মেয়েদের টার্গেট বানায়। কোথায়, একটা মুসলিম মেয়ে যখন হিন্দু ছেলেকে বিয়ে করে ওরা চুপ করে বসে থাকে দেখেছিস? এদের কী করা উচিত জানিস? হিটলারের কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের মতো, সবকটাকে একসঙ্গে ঢুকিয়ে মেরে ফেলা উচিত। সমাজ থেকে কতগুলো জঞ্জাল দূর হবে। অশিক্ষা, কুশিক্ষা, আর সবাইকে কনভার্ট করতে হবে। কেন রে? কনভার্ট করে কী হবে?”

আদিত্য চেঁচিয়ে ফেলেছিল। আশপাশের টেবিল থেকে সবাই তার দিকে তাকাল। আদিত্য চুপ করে গেল।

সুশোভন বললেন, “আদিত্য, ভেতরের পশুটাকে বের করিস না। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে একটা পশু লুকিয়ে আছে। কেউ ইন্ধন পেয়ে সেটাকে বের করে ফেলি, কেউ বা আজন্মকাল সযত্নে সেটাকে লুকিয়ে রেখে দি। ভেতরে ভেতরে আদতে আমরা সবাই মারাত্মক কমিউনাল। রেড রোডে নামাজ পড়তে দেখলে কখনও শ্লেষ করি, হিন্দুদের ধর্মের জন্য মাতামাতি করতে দেখলে ওরাও হাসাহাসি করে। সমস্যাটা হল, যত দিন যাচ্ছে, মানুষের মধ্যে ধর্মবোধটা বড্ড বেশি চাগাড় দিচ্ছে। মনে করে দেখ, আমাদের ছোটোবেলায় এসব ব্যাপার এতটা ছিল না। ইদানীং সবাই কেমন আফিমের মতো সব কিছু ভুলে ধার্মিক হয়ে উঠছে। কিন্তু এটা কি সলিউশন? আই উইশ, সবরকম ধর্মকে

একবারে তুলে দেওয়া যেত। পৃথিবীর আসল সমস্যাগুলোর দিকে কেউ নজর দেবে না, পলিউশন, ক্যান্সার, গ্লোবাল ওয়ার্মিং নিয়ে ভাববে না, সারাক্ষণ ধর্ম ধর্ম করে যাচ্ছে। এই রিন্টু ছেলেটা ফিজিক্সে অনার্স জানিস? ফিজিক্স, ভাব জাস্ট। সে ছেলে এরকম ব্রেনওয়াশড হয়ে গেল। তুই, তোর মতো একটা সেনসিটিভ ছেলে এখন কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের কথা বলছিস। নিজে ঠান্ডা মাথায় ভাবিস তো, কী বললি। কেন এগুলো তোর মাথায় আসবে?”

আদিত্য লজ্জিত হল। বলল, “হুঁ। ঠিকই। আমার মাথা কাজ করছে না অ্যাকচুয়ালি।”

সুশোভন বললেন, “স্বাভাবিক। মানুষের মাথা যেখানে কাজ করা বন্ধ করে এরকম পরিস্থিতিতে, তখন থেকেই তারা কোণঠাসা হয়ে গিয়ে এসব ভাবতে, বলতে শুরু করে। তা ছাড়া ইন্ধন দেওয়ার মানুষের তো অভাব নেই। সাধে কি আর আমাদের দেশে সামান্য কোনও মাংস থেকে দাঙ্গা লাগিয়ে দেওয়া সম্ভব? ফ্রাস্ট্রেটেড হতে হতে মানুষ চিন্তাভাবনা করা ছেড়ে দিচ্ছে। সারাক্ষণ ধর্মের আফিমে বুঁদ হয়ে থাকতে চাইছে। বিলিভ মি আদিত্য, এগুলো সলিউশন নয়। মানুষকে মেরে ধর্ম শেখানো কোনও সলিউশন হতে পারে না।”

আদিত্য একগ্লাস জল খেল। তারপর বলল, “কী করব এবারে?”

সুশোভন বললেন, "মাথা ঠান্ডা কর। সিচুয়েশন এসেছে, হ্যান্ডেল কর। রাগ করিস না। বউকে বোঝা। জীবন এতটাও কঠিন না যতটা আমরা করে দি।"

আদিত্য চুপ করে বসে রইল।

৩৯

আদিত্য ঘরে ঢুকলে ঝুমকি জিজ্ঞাসু চোখে তার দিকে তাকাল।

আদিত্য বলল, "খেয়ে নিস। খাবার এনেছি।"

ঝুমকি বলল, "আচ্ছা। ও বাড়ির কী খবর?"

আদিত্য খাবারের প্যাকেট টেবিলের ওপর রেখে বলল, "তোর বাবা মা দিদি চিন্তা করছিল দেখে বলে দিয়েছি তুই এখানে আছিস।"

ঝুমকি বলল, "ওরা কী বলল?"

আদিত্য চেয়ার টেনে বসল, "পরিস্থিতি ভাল। তোর বাবা যেমন মারমুখী হয়ে ছিলেন এখন অতটা নেই। আশা করছি তোর হোম ফ্রন্ট বেশি ঝামেলা করবে না আর।"

ঝুমকির মুখ আলোকিত হল, "সত্যি?"

আদিত্য মাথা নাড়ল, "হুঁ। আর তোর ওই জানোয়ারটা আবার চমকাতে চেষ্টা করছে। ভালোবাসার টান আর কি। খুব ভালোবাসে তোকে বোঝাই যাচ্ছে।"

ঝুমকি বলল, "ভালোবাসা কতটা সেটা তো বুঝেছি। সবটাই দখল করে রাখার চেষ্টা। মানুষ যে এত তাড়াতাড়ি এভাবে চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে ওকে না দেখলে আমি বিশ্বাস করতে পারতাম না।"

আদিত্যর ফোন বাজছিল। আদিত্য দেখল রুমকি ফোন করছে। আদিত্য ফোনটা ঝুমকির দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "ধর, তোর দিদি।"

ঝুমকি বলল, "তুমি কথা বলবে না?"

আদিত্য বলল, "কথা বল।"

ঝুমকি ফোনটা ধরল, তিরিশ সেকেন্ড কথা হতে পারল না কাঁদতে শুরু করল।

আদিত্য উঠে নিজের ঘরে গেল। ভালো লাগছিল না তার।

মানুষ অনেক মানুষের মধ্যে থেকেও কখনও কখনও একা হয়ে পড়ে। খাটের ওপর বসে দেওয়ালে টাঙানো বিয়ের ফটোর দিকে চোখ গেল। দুজনে কী সুন্দর হাসছে! একটা ছবি কত ভুল বার্তা দিতে পারে!

খালি চোখে দেখে যেটা মনে হয়, বাস্তবটা তার থেকে কখনও কখনও অনেক দূরে হয়। রুমকির সন্দেহপ্রবণতা এমন হল যে নিজের বোনকে নিয়েও সন্দেহ করতে ছাড়ল না! এত দিনে তাকে এই চিনল?

দীর্ঘশ্বাস ফেলল আদিত্য। একইসঙ্গে বিরক্ত হল। অফিসে বেশ কিছু কথা শুনতে হবে তাকে। এভাবে ডুব দেওয়া যে ঠিক না তার থেকে আর কে ভালো বোঝে!

ঝুমকি নক করল, “দিদি কথা বলবে।”

আদিত্য বলল, “আচ্ছা দে।”

ঝুমকি ফোনটা দিয়ে চলে গেল।

আদিত্য ফোন কানে না নিয়ে কেটে দিল।

রুমকি আবার ফোন করছে।

আদিত্য কয়েক সেকেন্ড ফোনের দিকে তাকিয়ে ধরল, “হ্যালো।”

রুমকি বলল, “তুমি কেটে দিলে কেন?”

আদিত্য বলল, “কেটে গেছে। বলো কী বলবে। ঝুমকি আমার পাশে আছে নাকি এটা বোঝার জন্য ফোন করেছ তো?”

রুমকি একটু চুপ করে থেকে বলল, “মা খুব কান্নাকাটি করছে। ঝুমকিকে দেখতে চাইছে। আমি মাকে নিয়ে আসছি।”

আদিত্য বলল, “হ্যাঁ, আর ওরা বুঝে গিয়ে এ বাড়িতে অ্যাটাক করুক। এরকম হলেই ভালো হয়, তাই না?”

রুমকি বলল, “আমি সেটা বলিনি। মা কাঁদছে, বাবা চিন্তা করছে, আমি কী করব?”

আদিত্য বলল, “জানি না কী করবে, তবে তোমার মা এলে ওরা ঠিক জেনে যাবে। ওরা নিশ্চয়ই আমাদের বাড়ির দিকেও নজর রাখছে।”

রুমকি বলল, “তাহলে আমি যাচ্ছি। আমি তো নিজের বাড়ি যেতে পারি, নাকি তাও না?”

রুমকির গলাটা শ্লেষাত্মক শোনাল। আদিত্যর মাথাও খানিকটা গরম হল, বলল, “এসো। আমারও তাহলে অফিস ফেলে বাড়িতে বসে থাকতে হয় না। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে আমারও যে খুব ভালো লাগে, তা তো নয়।”

রুমকি বলল, “ঠিক আছে। আমিই যাচ্ছি। আর বাবা বলছিল ঝুমকিকে শুদ্ধিকরণ করাবে।”

আদিত্য বলল, “গো-মূত্র খাওয়াবে বুঝি? আর গোবর? এগুলোই বাকি আছে তো! এসবই করো তোমরা।”

রুমকি বলল, “তুমি রেগে যাচ্ছ কেন? রাগার তো কিছু নেই! ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ওকে অন্য একটা ধর্মের লোকজন নিয়ে গেছে, রেপ করেছে, সেটার শুদ্ধিকরণ করা দরকার না?”

আদিত্যর মনে হচ্ছিল মাথা এত গরম হচ্ছে যে কেউ ইচ্ছা করলে মাথায় অমলেট ভেজে ফেলতে পারে। ভীষণ জোরে চ্যাঁচ্যাতে ইচ্ছা করছিল। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে

বলল, “তুমি এসো। এসে আমাকে উদ্ধার করো। আর যন্ত্রণা দিয়ো না। এসব কথা আমাকে বলবে না দয়া করে। আমি নিতে পারছি না।”

রুমকি বলল, “এখন বেরোচ্ছি আমি। তুমি কিছু খেয়েছ?”

আদিত্য বলল, “সেসব তোমার জানার দরকার নেই। বললাম তো, এসে উদ্ধার করো আমায়!”

রুমকি বলল, “ঠিক আছে, আমি বেরোচ্ছি। রাখলাম।”

আদিত্য ফোন কেটে গুম হয়ে বসে রইল।

৪০

রুমকি এসেছে। একাই। বাবা বা মা কাউকে আনেনি।

আদিত্য দরজা খুলতে রুমকি তাকে দেখে বলল, “ঝুমকি কোথায়?”

আদিত্য বলল, “গেস্ট রুমে।”

রুমকি ঘরে ঢুকলে আদিত্য দরজা বন্ধ করল।

রুমকির গলা পেয়েছিল ঝুমকি। একপ্রকার ছুটে চলে এল।

রুমকিকে জড়িয়ে ধরতে যাচ্ছিল, তাকে একপ্রকার চমকে দিয়ে রুমকি ঝুমকিকে জোরে একটা চড় কষাল।

ঝুমকি কেঁদে ফেলল।

রুমকি বলল, "এটা তুই কী করেছিস? একবার আমাকে বলতে পারতিস না?"

ঝুমকি কাঁদতে কাঁদতে মেঝেতে বসে পড়ল।

আদিত্য কয়েক সেকেন্ড চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে নিজের ঘরে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পর রুমকি এসে বলল, "তুমি ও ঘর থেকে চলে এলে কেন?"

আদিত্য বলল, "কী করব? তুমি এসে গেছ যখন তুমিই দ্যাখো। আমার অফিস যেতে হবে কাল থেকে।"

রুমকি বলল, "সে যা খুশি করো, ঝুমকিকে ও বাড়ি নিয়ে যেতে হবে। বাবা বলল, প্রায়শ্চিত্তর ব্যবস্থা করে দেবে।"

আদিত্য রাগল না। ঠান্ডা মাথায় রুমকির দিকে তাকিয়ে বলল, "একটা রিকশা আর একটা মাইকের ব্যবস্থা করে দেব? তাহলে বেরিয়ে সবাইকে বলে বেড়াতে পারবে ঝুমকি বাড়ি ফিরে এসেছে? রিন্টুদেরও তাহলে দলবল নিয়ে এসে তোমাদের বাড়ি ভাঙচুর করতে সুবিধা হবে।"

রুমকি একটু থতোমতো খেয়ে পরমুহূর্তে সামলে নিয়ে বলল, "তুমি রেগে যাচ্ছ কেন? রাগ করার মতো কিছু বলেছি?"

আদিত্য বলল, "নাহ। কিছুই বলোনি। শোনো সুশোভনের সঙ্গে কথা না বলে আমি অন্য কোনও কিছু ভাবতে পারছি না।"

রুমকি খাটে বসে বেডকভারের দিকে কয়েক সেকেন্ড তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল।

তারপর বলল, "ছেলেটা ঝুমকিকে রেপ করেছে। প্রোটেকশনও নেয়নি। আমার মনে হয় বোনের মেডিক্যাল টেস্ট করা দরকার। যদি কোনও অঘটন হয়? যদি কোনও রোগ এসে যায়?"

আদিত্য বলল, "তোমার কোনও ধারণা আছে ওদের র‍্যাকেটটা ঠিক কত বড়ো? কত শক্তিশালী ওরা? দুটো দিন যেতে দাও।"

রুমকি বলল, "মেডিক্যাল টেস্ট এখনই করতে হত।"

আদিত্য বলল, "বেশ তো, করা হবে।"

রুমকি গুম হয়ে কয়েক সেকেন্ড বসে থেকে বলল, "বোনটা এই দুদিনেই কেমন যেন হয়ে গেছে। একবার ভাবছি কষিয়ে পরপর চড় মারি, আর-একবার মনে হচ্ছে বুকে জড়িয়ে ধরি।"

আদিত্য চুপ করে রইল।

রুমকি নরম গলায় বলল, "আমি তোমার সঙ্গে মিসবিহেভ করেছি। ঠিক করিনি। আমার ভুল হয়ে গেছে।"

আদিত্য অবাক হল। রুমকি ক্ষমা চাইছে? সূর্য কোনদিকে উঠেছিল আজ কে জানে! সে বলল, "সুশোভন সিকিউরিটির ব্যবস্থা করবে। তবু তুমি বেরোলে একা বেরিয়ো। ঝুমকিকে নিয়ে বেরোবে না। ব্যালকনিতেও যেন ঝুমকি না যায় খেয়াল রাখবে। এভাবে কোনও দোষ না করে কতদিন এভাবে থাকতে হবে সেটা যদি জানতাম।"

রুমকি খানিকটা ইতস্তত করে বলল, "বাবা বলছিল ঝুমকিকে মুম্বইতে যদি দিয়ে আসা যেত। বাবার এক বন্ধুর ছেলের জন্য মেয়ে দেখা চলছে। ওদের কিছু না বলে কোনওভাবে বিয়েটা দিয়ে দিতে পারলে ভালো হত। বাবার সঙ্গে একবার কাকাবাবুর ঝুমকিকে নিয়ে কথা হয়েছিল। সেবারে কথা বেশি এগোয়নি। কোনওভাবে যদি পাঠানো যেত..."

আদিত্য কয়েক সেকেন্ড রুমকির দিকে তাকিয়ে বলল, "ঝুমকিকে জিজ্ঞেস করেছ ঠিক এই মুহূর্তে ও আর-একটা সর্বনাশের জন্য প্রস্তুত নাকি? আর মুম্বই যাবার কথা বলছ? আমাকে নিয়ে যেতে হবে? পারলাম না। যে শহরে জন্মেছি, বড়ো হয়েছি, মানুষ হয়েছি, আমার কাছে সে শহরের থেকে বেশি নিরাপদ শহর আর কিছু হয় না।"

রুমকি বলল, "তুমি কি চাও ঝুমকি এ বাড়িতেই থেকে যাক?"

আদিত্য বলল, "আমার চাওয়া না-চাওয়ায় কিছু যায় আসে না। এভাবে বেশিদিন চলবেও না। সত্যিটা সবাই জেনে যাবে কদিন পর। একটা জলজ্যান্ত মেয়েকে এভাবে মৃত দেখানো তো সম্ভব না। ওরা জানলেই প্রেশার পলিটিক্স শুরু করবে।"

রুমকি বলল, "যদি ঝুমকির পেটে বাচ্চা চলে আসে তাহলে সেটাকে নষ্ট করার মতো কোনও ডাক্তার চেনো?"

আদিত্য বিরক্ত চোখে রুমকির দিকে তাকাল।

৪১

রুমকি ঝুমকির কাছে গিয়ে বসেছে। দু বোনে মিলে কান্নাকাটি করছে।

আদিত্যর অসহ্য লাগছিল। রুমকি এরকম কেন? একদিকে তাকে সন্দেহও করছে, আর-একদিকে বোনের কাছে গিয়ে করুণাসাগর সাজছে।

একটা সম্পর্কে কেউ থাকলে খামোখা সন্দেহ আসবে কেন? একসঙ্গে থাকার পরে রুমকি তাকে এখনও চিনে উঠতে পারল না। সব পুরুষ কি এক হয়? একজন পুরুষ ধর্ষণ করে, আর-একজন পুরুষ তো মেয়েদের রক্ষাও করে। হাতের সব আঙুল কখনও সমান হয় না রুমকি বুঝবে না? পুরুষ মানেই খারাপ, চরিত্রহীন, আর মেয়ে মানেই অসহায়, এই সরলীকরণ হাস্যকর।

আদিত্য কিছুক্ষণ খাটে শুয়ে থেকে উঠল। তৈরি হয়ে বেরিয়ে রুমকিকে বলল, "আমি একবার অফিস থেকে ঘুরে আসছি। দেখা করে আসাটা দরকার। ঝুমকিকে নিয়ে কোথাও বেরোবে না। বাড়িতে কেউ এলে ঝুমকি যেন বাইরে না যায়। কেউ না, এমনকি পাশের বাড়ির কাকিমা এলেও ঝুমকি সম্পর্কে কোনও কথা বলবে না। বুঝতে পারছ আমি কী বলতে চাইছি?"

রুমকি বলল, "আমি তো ভাবছিলাম তুমি থাকলে ওকে সন্ধে হলে বাড়িতে নিয়ে যাব।"

আদিত্য বলল, "বললাম তো এখন বের করা সম্ভব না। ওদের কড়া নজর থাকবে। সুশোভনের সঙ্গে কথা বলে পরবর্তী স্টেপ ঠিক করব। যদি কোনও অশান্তি না চাও, তাহলে দয়া করে আমি যেমন বলছি সেভাবে চলো।"

রুমকি বলল, "ঠিক আছে।"

আদিত্য বলল, "দরজাটা বন্ধ করে দাও।"

রুমকি বেরোল। ঘরের বাইরে এসে বলল, "তুমি রাগ করে আছ?"

আদিত্য জুতো পরতে পরতে বলল, "কেন, রাগ করার মতো তুমি কী করেছ?"

রুমকি বলল, "ঠিক আছে, সাবধানে যেয়ো।"

আদিত্য বলল, "দয়া করে কোনওরকম ওপর চালাকি করবে না ঝুমকিকে নিয়ে। মারাত্মক সেনসিটিভ একটা ইস্যু শহর জুড়ে তৈরি হয়ে আছে। ছোটোখাটো কোনও কিছু হয়ে নেই ব্যাপারটা। তুমি নিজেও বুঝতে পারবে না কী থেকে কী হয়ে যেতে পারে।"

রুমকি বলল, "ওপরচালাকি কথাটা কেন ইউজ করলে? আমি কী ওপরচালাকি করি?"

আদিত্য বলল, "অনেক কিছুই করো। সব কিছু তো বুঝিয়ে বলা সম্ভব নয়। তবে এটুকু বলতে পারি তোমার একটা ছোটো ভুল বা পাকামি তোমার ফ্যামিলির প্রতিটা মানুষের লাইফ থ্রেট হতে পারে। আশা করি বোঝাতে পারলাম।"

রুমকি রেগে গেল, "তুমি আমাকে এভাবে ঠুকে ঠুকে কথা বলছ কেন? দুদিনে আমি খারাপ হয়ে গেলাম? আগে তো এরকম করে কথা বলতে না!"

আদিত্য বলল, "আগে এত বড়ো ক্রাইসিস কখনও আসেনি। আমি এভাবে তোমার সঙ্গে কথা বলছি, কারণ এভাবে কথা না বললে তুমি বুঝবে না। তোমার মাথায় ঢুকবে না। এই কারণেই তোমাকে বলিনি শুরুতেই। মেয়েটা যতক্ষণ ছিল না চিন্তা করলে, যেই ফিরল, প্রায়শ্চিত্ত থেকে শুরু করে মুম্বই পাঠিয়ে দেওয়া অবধি ভেবে ফেলছ। এর থেকে হাস্যকর আর কিছু হয় না। এই মুহূর্তে, যেখানে আমাদের সব কিছু থিতিয়ে যাওয়া অবধি অপেক্ষা করে যাওয়া উচিত ছিল, তোমরা সেখানে ঝামেলা করার জন্য একের পর এক সিদ্ধান্ত নিতে শুরু করে দিয়েছ। আমার তোমাদের বলাটাই ভুল হয়েছে। আরও পরে বলতে হত।"

রুমকি বাঁকা সুরে বলল, “আচ্ছা, তাই বুঝি? না বললেই ভালো হত বলো? এভাবে চললেই তো ভালো ছিল!”

আদিত্য বেরোতে যাচ্ছিল, থমকে দাঁড়িয়ে বলল, “মানে? কী বলতে চাইছ?”

রুমকি কঠিন মুখে বলল, “যা বলছি বুঝতেই পারছ।”

আদিত্য চুপ করে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থেকে ঠান্ডা গলায় বলল, “একটা ট্যাক্সি ডেকে দিচ্ছি, ঝুমকিকে নিয়ে এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও। থাকতে হবে না। জাস্ট গেট লস্ট।”

রুমকি তার দিকে চমকে তাকিয়ে বলল, “মানে?”

আদিত্য বলল, “মানেটা পরিষ্কার, তোমাকে আর তোমার বোনের বা তোমাদের ফ্যামিলির অনেক হেল্প করেছি, করে যখন তুমি আমার দিকেই আঙুল তুললে তখন থাকল। জাস্ট বেরিয়ে যাও। আমি ডিভোর্স ফাইল করব। যা হবে দেখা যাবে।”

রুমকি তার দিকে আগুনে চোখে তাকিয়ে বলল, “এত বড়ো কথাটা তুমি বলতে পারলে?”

আদিত্য বলল, “হ্যাঁ, বলতে পারলাম। তুমি তার থেকেও অনেক বড়ো কথা বলেছ। আমি অনেকক্ষণ সহ্য করেছি। আর পারলাম না। জাস্ট বেরিয়ে যাও। নইলে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করব।”

রুমকি তার দিকে কয়েক সেকেন্ড আগুনে চোখে তাকিয়ে জোরে জোরে শব্দ করে ঝুমকির ঘরের দিকে এগোল।

৪২

সুশোভনকে ফোন না করেই পুলিশ কোয়ার্টারে পৌঁছে আদিত্য সমস্যায় পড়ল।

সুশোভন কোয়ার্টারে ছিল না। ফোন করে জানা গেল ওর ফিরতে আর-একটু দেরি হতে পারে। আদিত্য কমপ্লেক্সের বাইরে চায়ের দোকানে চা খাচ্ছিল। মাথা ঠিক নেই। রুমকি বাড়িতে এসে নতুন কী ঝামেলা তৈরি করবে বোঝা যাচ্ছে না।

চায়ের দোকানে মন্দির নিয়ে আলোচনা চলছে। মসজিদ ভাঙা হয়েছিল, তার জায়গায় মন্দির হবে। মানুষ বেশ খুশি।

আদিত্যর অস্বস্তি হচ্ছিল। সবার খুশিই ভীষণ প্যাসিভ। নিজের জীবনে খুশির লেশমাত্র নেই মানুষের। অন্যের ক্ষতিতেই যেন আনন্দটা বেশি আসে আজকাল।

রুমকি মেসেজ করেছে। তাড়াতাড়ি ফেরে যেন। অনেক কথা আছে।

আদিত্য দেখল শুধু। উত্তর দিল না। কোনও কোনও ঘটনায় জড়াতে না চাইলেও জড়িয়ে যেতে যেতে একসময় এমন অবস্থা হয় যে বেরোনোর পথ থাকে না। রিন্টুর নাম রুবেল, এটা জানার পর ঝুমকি যেমন বেরোতে চেয়েছিল।

আদিত্য ভাবল, সত্যিই তো! ভালোবেসে বেরোতে চেয়েছিল, কেন বেরোতে চাইবে? পরক্ষণে মনে হল একটা সম্পর্কে প্রবেশের আগে অপর পক্ষকে নিজের খুঁটিনাটি জানানোটাও সম্পর্কের প্রধান শর্ত হওয়া উচিত। ভালোবাসাটা যদি মোক্ষ হত, তবে ভালোবেসেই রিন্টু ঝুমকিকে অনায়াসে জয় করতে পারত। ঝুমকির পালিয়ে আসার প্রয়োজন পড়ত না। জোর করা কেন? নিজের ধর্মে আর-একজন মানুষ বাড়িয়ে কী হবে? আদিত্য বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

এখন কি আবার ক্রুসেডের সময় আসছে? সেই মধ্যযুগই ফিরে আসবে? মানুষের থেকে ধর্ম বড়ো হয়ে যাচ্ছে?

চা বিস্বাদ লাগছিল তার। ফেলে দিল। সুশোভনের জিপ থেকে নেমে চায়ের দোকানেই এলেন। তাকে দেখে বললেন, "কী ব্যাপার? গৃহে শান্তি নেই?"

আদিত্য কাঁধ ঝাঁকাল। সুশোভন সিগারেট ধরিয়ে বললেন, "চ ভেতরে গিয়ে বসি।"

দুজনে মিলে হাঁটতে হাঁটতে পুলিশ কমপ্লেক্সে ঢুকল। আর পাঁচটা কমপ্লেক্সের মতোই। প্রায় সব কোয়ার্টার থেকেই সিরিয়ালের গান ভেসে আসছে।

সুশোভন বললেন, “তোকে দেখে আজকাল মনে হয় বিয়ে না করে বেঁচে গেছি। মানে কতরকম জ্বালা ভাব মানুষের। বিয়ে করে এক জ্বালা। শ্বশুরবাড়ির পরিবারকে রক্ষা করলে এক জ্বালা। না করলে আর-এক। মানে যা তা মাইরি!”

দরজা খুললেন সুশোভন। আদিত্য বিরক্ত গলায় বলল, “ঝুমকি আমার নিজের বোন হলে কান ধরে ঠাস ঠাস করে দুটো চড় মারতাম। পাকা মেয়ে কোথাকার!”

সুশোভন সোফায় বসে জুতো খুলে জুতোজোড়া সোফার তলায় ঠেলে দিয়ে বললেন, “ভুল করছিস। পাকামির কিছু নেই। ভুলের থেকেও বড়ো কথা, ভিকটিম ব্লেমিং করছিস। এটা যে-কোনো রেপের পর পলিটিক্যাল লিডাররা করে। যে রেপড হয়েছে, দোষটা যেন তারই। ঝুমকির দোষ খুঁজছিস তোরা। অথচ আমরাই নিঃশর্ত এবং নিঃস্বার্থ ভালোবাসা খুঁজি।”

আদিত্য গুম হয়ে বসল। সুশোভন সিগারেটে একটা সুখটান দিয়ে বললেন, “দিস র‍্যাকেট ইজ ইনক্রিজিং। লাভ জিহাদ অ্যান্ড অল। কনভার্ট অ্যান্ড দেন ম্যারেজ অর

ভাইস ভার্সা। অনেকটা স্লিপার সেলের মতো কাজ করে ব্যাপারটা। হুইসপার ক্যামপেনিং, অ্যাজ ইফ অন্য ধর্মের মেয়ে বিয়ে করাটা বিরাট কৃতিত্ব।”

আদিত্য বলল, “আমি কী করব সেটা বল। কাল থেকে অফিস জয়েন করব? রুমকিরা প্ল্যান করছে ঝুমকিকে দূরে কোথায় পাঠাবে।”

সুশোভন হাসলেন, “দূরে মানে? আউটসাইড কান্ট্রি?”

আদিত্য মাথা নাড়ল, “না আউটসাইড স্টেট।”

সুশোভন বললেন, “ধুস, এদের নেটওয়ার্ক কতটা তোদের কোনও ধারণা নেই বলে বলছিস। যেদিন খুঁজে পাবে পাতি খুন করে দেবে।”

আদিত্য শিউরে সুশোভনের দিকে তাকিয়ে বললেন, “এখন কী করার আছে?”

সুশোভন তার দিকে তাকিয়ে বললেন, “আমিও অন্ধকারে। জাস্ট ভেবে যাচ্ছি কী করা যেতে পারে। তুই অফিস জয়েন কর। আর রুমকিকে বল এখন চুপ করে থাকতে।”

আদিত্য বলল, “ওটাই তো ওদের সমস্যা। চুপ করে থাকলে তো হয়েই যেত!”

সুশোভন বললেন, "ওকে, চল আমি যাব তোর বাড়ি। আমি বললে যদি কিছু হয়।"

৪৩

সুশোভনকে নিয়ে আদিত্য বেরোতে গিয়ে রাস্তাতেই বাধা পেল। মিছিল বেরিয়েছে।

সুশোভন বললেন, "মিছিলটা শান্তই, তবে মিছিলের মধ্যে কয়েকজনের বডি ল্যাংগুয়েজ সুবিধের লাগছে না। এনআরসি বিরোধী মিছিল মানেই এখন রেড অ্যালার্ট থাকছে।"

আদিত্য বিরক্ত মুখে বলল, "চারদিকে সমস্যা। বাড়িতে সমস্যা, বাইরে সমস্যা। এত সমস্যা হলে তো পাগল হয়ে যাব রে।"

সুশোভন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "সময়টাই বড্ড খারাপ যাচ্ছে বুঝলি। মানুষজনও কনফিউজড হয়ে যাচ্ছে। কোনটা ভালো, কোনটা খারাপ বুঝতে পারছে না। ইভেন আমিও জানি না এনআরসি করে কী লাভটা হবে। তবে এই এক শ্রেণির মানুষকে যে তাতানো হচ্ছে মারাত্মক পরিমাণে, সেটা বুঝতে পারছি। এই যে জ্যামে আটকা পড়ে আছিস এদের জন্য, এই বিশেষ পোশাক পরিহিত মানুষজনকে, যাদের সারাবছর তেমন চোখেই পড়ে না রেড রোডে নামাজের সময়গুলো বাদ দিয়ে, তোর মনে হচ্ছে না একটা বন্দুক নিয়ে সবাইকে শেষ করে দিই? আদতে, সমস্যার গভীরে গেলে দেখতে পাবি তোর থেকে এরাও খুব একটা আলাদা আনন্দে নেই। এরাও কষ্টে আছে, সমস্যায় আছে। পেটের সমস্যা আছে। সময় বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রায়োরিটি চেঞ্জ

হওয়া প্রয়োজন ছিল। দুর্ভাগ্যবশত সেটা হয়নি। মধ্যযুগেও ব্যাপারটা ধর্মে আবদ্ধ ছিল, ব্রিটিশ আমলেও। তুই জাস্ট ভাব, একটা জাত আমাদের দুশো বছর শাসন করল। কোথায় তাদের তাড়ানোটা আমাদের কাছে প্রাধান্য পাবে তা নয়, সুকৌশলে তারা আমাদের দুভাগ করে দুটো দেশে ভাগ করে দিয়ে চলে গেল। বাঙালির মেরুদণ্ডটাই ভেঙে দিয়ে চলে গেল। এতদিন পরে কোথায় সেই ক্ষত নিরাময়ের চেষ্টা করব আমরা তা নয়, এখনও সেই ধর্মটাই আমাদের কাছে প্রাধান্য পেয়ে যাচ্ছে।"

আদিত্য বলল, "তুই আমাকে একটা কথা বল, ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ হল। তাহলে পাকিস্তান মুসলমানদের হল আর ভারত কেন ধর্মনিরপেক্ষ হল? হিন্দুরা আলাদা হল না কেন?"

সুশোভন বললেন, "সেটা ভালো হল না খারাপ হল?"

আদিত্য বলল, "অবশ্যই খারাপ হল। আমরা, মানে হিন্দুরা অহেতুক উদারতা দেখাতে যাব কেন?"

সুশোভন বললেন, "উদারতা দেখানোর প্রয়োজন নেই বলে। যদি বলি দেশটা ধর্মনিরপেক্ষ থাকল বলেই দেশের একটা পচা অংশ পার্টিশনের ফলে বেরিয়ে গিয়ে দেশটা শুদ্ধ হয়েছিল বলে? ভারতবর্ষ তো বরাবরই সব ধর্মের দেশ। এই সেই জায়গা যেখানে শাসকেরা শাসন করতে এসে এই দেশের প্রেমে পড়ে গেছিল। মুঘল শাসকেরা

যদি এই দেশ লুটতে আসত, তবে তো তারা সব সম্পদ নিয়ে পালাতে পারত, যেটা ব্রিটিশরা করেছিল। কোহিনুর থেকে শুরু করে মুঘল স্থাপত্যের সব মণিমুক্তো খুঁটে খুঁটে নিয়ে পালিয়েছিল ব্রিটিশরা। এ দেশের সবথেকে বড়ো শত্রু তো তারাই। জাতের নামে, ধর্মের নামে সব ভাগ করে দিয়ে চলে গেল। সঙ্গে যুক্ত হল একজন রামমোহন না পাওয়া, একজনও বিবেকানন্দ না পাওয়া একটা জাতি। মুসলমানদের আমরাও কি কম উপেক্ষা করেছি? এই মধ্যযুগীয় লাভ জিহাদের কথা ওরা ভাবছে কী করে? আর কোনও উদ্দেশ্য নেই কেন ওদের? আমরাই আমরা-ওরা করে ওদের দূরে সরিয়ে রেখেছিলাম বলেই তো। কেন এখনও ধর্মে ধর্মে বিয়েতে এত সমস্যা হবে? তুই জানিস, এক মুসলিম মেয়ে এক হিন্দু ছেলেকে বিয়ে করবে বলেছিল বলে তার বাবা দাদা মেয়েটাকে বাড়ি থেকে নিয়ে গিয়ে বড়ো রাস্তায় জাস্ট পাথর ছুড়ে মেরে ফেলেছে? কতটা অশিক্ষা, কতটা গোঁড়ামি থাকলে এই মানসিকতা আসে ভাব তো। ধর্ম জিনিসটাই এত সমস্যার কারণ। এর ফলেই এত চাপানউতোর চলছে চারদিকে। আমার তো মনে হয় এ দেশে অটোক্রেটিক কোনও শাসন আসা দরকার, যারা সবার আগে ধর্ম জিনিসটাকেই ব্যান করে শুধু যুক্তিবাদের চাষ করাতে বাধ্য করবে। জ্যোতিষ থেকে শুরু করে রাস্তায় রাস্তায় শনি মন্দির, পিরের মাজার সব ভেঙে গুঁড়িয়ে দিক। দাঙ্গা ছড়ানোর প্ল্যান করলে জাত ধর্ম না দেখে গুলি করে মেরে দিক। দেখবি সব ঠিক হয়ে গেছে। ভাবা যায় একটা উন্নয়নশীল দেশে দাঙ্গা ছড়ানোর ভয়ে ইন্টারনেট বন্ধ করে দিতে হয়? হাউ রাবিশ!”

মিছিলে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। একদল মানুষ রাস্তায় টায়ার পোড়াচ্ছে। আদিত্য হতাশ চোখে সেদিকে তাকিয়ে বলল, “ঠিকই বলেছিস। উই নিড অ্যান অটোক্রেটিক লিডার।”

৪৪

সুশোভনকে নিয়ে যখন বাড়ি পৌঁছল আদিত্য, তখন রাত সাড়ে দশটা বাজে। রুমকি দরজা খুলে দুজনকে দেখে রাস্তা ছেড়ে দিল।

সুশোভন হাসিমুখে জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার? সব ঠিক আছে?"

রুমকি একবার আদিত্যর দিকে তাকিয়ে থমথমে চোখে সুশোভনের দিকে তাকিয়ে বলল, "কী করে থাকবে? সমস্যা তো কিছু মেটেনি।"

আদিত্য বিরক্ত হল। রুমকি এখন সুশোভনের কাছে কাঁদুনি গাইতে শুরু করবে।

সুশোভন সোফায় বসে বললেন, "সমস্যাকে সমস্যা মনে করলে সমস্যা। প্রতিটা ফ্যামিলিতেই একটা না একটা সমস্যা হয়। যে বাড়িতে মেয়ে থাকে, সে বাড়ির লোকজনেরা টেনশনেই থাকে। তাই বলে আমরা যদি সব হাল ছেড়ে দি, তাহলে কী করে চলবে?"

আদিত্য বসেছিল। বলল, "ঝুমকি কোথায়?"

রুমকি বলল, "ঘরে আছে। থাক। সব জায়গায় ওর আসার দরকার নেই।"

সুশোভন বললেন, "কেন নেই? পর্দাপ্রথা মানছেন নাকি?"

রুমকি বলল, "তা নয়। আমি চাই না ওকে নিয়ে সব আলোচনায় ও থাকুক। একটা শকের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তো!"

সুশোভন কাঁধ ঝাঁকালেন, "তা ঠিক। তো এবার কী করা যায়?"

রুমকি বলল, "হায়দ্রাবাদে আমার এক কাকু কাকিমা থাকেন। ওকে আপাতত ওখানে পাঠানো হবে।"

আদিত্য চমৎকৃত হল। এতক্ষণে তাহলে রুমকি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রুমকি একটু ইতস্তত করে বলল, "তা ছাড়া ঝুমকির মেডিক্যাল টেস্ট করা দরকার বলে আমার মনে হয়। ও যদি প্রেগন্যান্ট হয়ে পড়ে..."

রুমকি থেমে গেল।

সুশোভন বলল, "আচ্ছা, যদি ছেলেটা, কী নাম যেন, রিন্টু, ওর ভুল বুঝে ক্ষমা চায় আর ঝুমকিকে ফেরত নিতে চায়, তাহলে?"

রুমকি রাগল এবার, “কোনও মতেই মানা যাবে না। মানা সম্ভবই না এটা।”

সুশোভন মাথা নাড়িয়ে বললেন, “সেটাই স্বাভাবিক। তবু বোনের সঙ্গে কথা বলে নেবেন। পরে দুর্বল হয়ে পড়ে যদি?”

রুমকি জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল, “প্রশ্নই আসে না।”

সুশোভন বললেন, “দেখুন এরকম হয় বলেই বলছি আমি। প্রশ্ন আসে না সবাই-ই ভাবে। তারপর দেবাকে সামনে দেখলে দেবী কান্নাকাটি শুরু করে দেয়। আপনার বোনের তরফ থেকে ছেলেটির বিরুদ্ধে স্ট্রং চার্জ আনা দরকার।”

রুমকি বলল, “তার আগে ওকে এই রাজ্য থেকে বের করা দরকার। সে ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবেন কি? আমার বাবা মা আসতে চাইছিল এখানে। ছেলেটার বাড়ি থেকে জেনে যাবার চান্স আছে বলে ওদের বহু কষ্টে আটকানো গেছে। এখন আমি চাই না ব্যাপারটা নিয়ে বেশি হইচই হোক।”

সুশোভন বললেন, “ধরুন আপনার বোনকে রাজ্য থেকে বের করে দিলেন। ফাইন। বিয়েও দিলেন। ফাইন। তারপর ওরা কোনও ক্ষতি করল? তখন? মেয়েটা তো একবারে উবে যাবে না!”

রুমকি দ্বিধাগ্রস্ত গলায় বলল, “তো? আপনি কী বলেন?”

সুশোভন বললেন, “দু পক্ষ বসুন। ঝামেলা মেটান।”

রুমকি শক্ত মুখে বলল, “অসম্ভব। আমরা ওই টেররিস্টদের সঙ্গে বসব না।”

আদিত্য বলল, “ঠিকই। ওরা সংখ্যায় বেশি থাকবে। সভ্যতা ভব্যতারও ধার ধারে না। ওদের কীভাবে বিশ্বাস করা যাবে?”

সুশোভন চিন্তিত চোখে চুপ করে থাকলেন কয়েক সেকেন্ড। সিগারেট ধরালেন। বেশ কয়েকটা টান দিয়ে বললেন, “আমিও আসলে হাতড়াচ্ছি বলতে পারিস। কনফিউজড আমিও। এরকম মানসিকতা নিয়ে কেউ যখন এগোয়, তাদের কীভাবে আটকাতে হবে আগে বুঝে উঠতে পারি না। একটা কেসে আমার ট্রান্সফার অবধি হয়ে গেল। আর কী কী অপেক্ষা করে আছে কে জানে।”

আদিত্য বলল, “এরকম হবে তা তো কোনও দিন স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। কেউ যে ভালোবাসার ফাঁদ পেতে রেখে এত বড়ো ক্রাইম করবে, আমি কী করে বুঝব?”

সুশোভন বললেন, "দেখ আইন খুব ক্লিয়ার এই ব্যাপারে। যদি মিয়া বিবি রাজি, তবে আইন কিচ্ছু বলবে না। একজন অরাজি থাকলে, তার ওপর প্রতারণা হলে আইন অভিযুক্তকে ছাড়বে না। মেয়েটিকে ডাকুন। আমি কথা বলতে চাই।"

সুশোভন রুমকির দিকে তাকাল।

৪৫

জামান সাহেব চেম্বারে একাই ছিলেন। সুশোভন ঢুকতে জামান বললেন, "এসো। তোমার সন্দেশখালি না ডায়মন্ড হারবার কোথায় যেন একটা ট্রান্সফার হয়েছে না?"

সুশোভন হাসলেন, "আর কী বলব সাহেব।"

জামান বললেন, "বসো। কেসটার আপডেট কী?"

সুশোভন বললেন, "ভালো না। মেয়ের বাড়ির লোকও যথেষ্ট গোঁড়া। একবার বলছে দূরে কোথাও বিয়ে দেবে, আর-একবার বলছে শুদ্ধ করবে, এদিকে ইজাজ মল্লিকের লোকেরাও তো ছেড়ে কথা বলবে না।"

জামান সুশোভনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এ দেশে মেয়ে হয়ে জন্মানোটাই পাপ বুঝলে? আমার মেয়েদের আমি লন্ডনে পড়তে পাঠিয়েছি বলে ভাই-বেরাদরি থেকে কম

কথা শুনতে হয় না। ইসলামে এই হারাম, ইসলামে ওই হারাম। এদের কী করে বোঝাব শিক্ষায় কোনও কিছু হারাম হয় না। মানুষ প্রকৃত শিক্ষিত হবে, এর থেকে ভালো কিছু আর হতে পারে না। তোমার ওই রুবেল শেখ বা রিন্টু, ছেলেটা তো শিক্ষিত। কী লাভ হল? মেয়েটাকে রেপ করল। কনভার্ট করে দিল।"

সুশোভন বললেন, "স্যার লাদেন ইঞ্জিনিয়ার। আইসিসের মাথাগুলো প্রায় সবকটাই উচ্চশিক্ষিত।"

জামান বললেন, "তবেই ভেবে দ্যাখো। সাধে কি রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্র হানো, এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক আনো! একদিকে এদের গোঁড়ামি শুরু হয়েছে, আর-একদিকে শুরু হয়েছে হিন্দুত্ববাদীদের তাণ্ডব। কী, না গোরুর মাংস ফ্রিজে রেখেছে বলে কুপিয়ে খুন করে দিল। আর-একজন ট্রেনে যাচ্ছিল, টিফিন খুলে মাংসের গন্ধ বেরিয়েছে, তাকে মেরে দিল টিফিনে গোরুর মাংস আছে বলে। সিস্টেম কখন ভুল পথে যায় বল তো? এদের বিরোধীরা এখন বলছে মাংসটা গোরুর না। মানে গোরুর মাংস হলে খুন করাটা জায়েজ, অন্য কিছুর মাংস তুমি খেতেই পারো।"

সুশোভন বললেন, "পরিস্থিতিটা এমন হয়ে দাঁড়াচ্ছে, শিক্ষিত মানুষেরাও ইসলামোফোবিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছে স্যার। ইসলামোফোবিয়া একটা রোগ, এটা বুঝছে না। যে লোকটা গোমূত্র খাচ্ছে, সে যেমন গোটা হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করছে না, তেমনি আজমল কাসভও কিন্তু গোটা মুসলিম ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করছে না।"

জামান বললেন, "উঁহুঁ। সমস্যাটা অন্য জায়গায় সুশোভন। আমাদের মধ্যে গোঁড়ামি বড্ড বেশি। এই কঠিন সময়ে দাঁড়িয়েও সেটা বাড়ছে বই কমছে না। আমাদের দোষেই বাকিরা আমাদের দিকে আঙুল তুলতে পারছে। বাংলাদেশের অভিজিৎ রায়ের কেসটা বলো। ভদ্রলোক নিজের মতো করে নাস্তিকতাকে প্রমোট করতেন। বইমেলায় এসেছিলেন। জামাতিরা তাঁকে কুপিয়ে খুন করে দিল। শার্লি হেবদো? কার্টুন আঁকা যাবে না। আঁকলেই খুন করে দেবে। কেন? ধর্ম কবে থেকে এত ভয়ংকর হয়ে উঠল? ধার্মিক হওয়া মানে কি মানুষে মানুষে খুনোখুনি? এই দুহাজার কুড়িতে এসে যদি আমরা এসব নিয়ে পড়ে থাকি তাহলে কিছু বলার নেই। তুমি জানো, আমি এই কালকেও একটা মাইনর বিয়ে আটকে এলাম সাউথ টুয়েন্টি ফোর পরগনা থেকে? আমাদের চাচার বাড়ি ওখানে। গিয়ে দেখি চোদ্দো বছর বয়সি মেয়েকে বিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমাকে গ্রামের লোক ঘিরে ধরে এই মারে কি সেই মারে। আমি চ্যাঁচামেচি করে, শাসিয়ে ব্যাপারটা আটকালাম। আমি মুসলমান বলে ওরা কথাটা শুনল। আমার জায়গায় তুমি থাকলে তোমাকে কুপিয়ে পুঁতে দিয়ে আসত। এই অশিক্ষিত ধর্মভিত্তিক দেশে মুক্তচিন্তা করা লোকেরা অপরাধী হয়ে যাচ্ছে। তাদের বিভিন্ন গালাগাল দিয়ে সম্বোধন করা হচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় হ্যারাস করা হচ্ছে। দিস ইজ ডিটোরিয়েটিং এভরিডে।"

জামান সাহেব হতাশভাবে মাথা নাড়লেন।

সুশোভন বললেন, “স্যার, আপনি ইজাজ মল্লিকের সঙ্গে বসুন। ব্যাপারটার একটা সুরাহা হোক। আমার বন্ধু, মানে আদিত্যর জীবনটা হেল হয়ে গেছে। সঙ্গে আমারও।”

জামান বললেন, “কাকে কাকে রাখতে চাও মিটিং-এ?”

সুশোভন বললেন, “আগে একটা প্রাইমারি মিটিং হোক। আমি আপনি আর ইজাজ মল্লিক থাকি। দরকার হলে ওই রিন্টু ছেলেটাকেও ডেকে নেওয়া যেতে পারে। যদি বুঝি আলোচনা ফলপ্রসূ হচ্ছে, তখন আমরা পরের স্টেপটা নিয়ে ভাবব।”

জামান বললেন, “ঠিক আছে। ইজাজ মল্লিক কিন্তু ঘুঘু লোক। সতর্ক থেকো সুশোভন।”

সুশোভন মাথা নিচু করলেন, “শিওর স্যার।”

৪৬

“আজকে ইউপিতে আমাদের তিনটে মহল্লা জ্বালিয়ে দিয়েছে হিন্দুরা।”

জামান সাহেবের চেম্বারে ঢুকতে ঢুকতে ইজাজ মল্লিক বলল। সুশোভন আর জামান আগে থেকেই বসে ছিলেন। জামান বললেন, “বসুন জনাব।”

ইজাজ মল্লিক চেয়ারে বসে সুশোভনের দিকে একবার তাকিয়ে জামানকে বলল, "উনি থাকবেন?"

জামান বললেন, "কেন? উনি হিন্দু বলে আপনার অসুবিধা?"

ইজাজ বলল, "আমার কোনও অসুবিধা নেই। হিন্দু, মুসল্লি, খ্রিস্টান সবই তো সামলাই। তবে এনাকে তো ট্রান্সফার করা হয়েছিল। ইনি নিজের কাজ না করে কলকাতায় কী করছেন সেটাই ভাবছি।"

সুশোভন বললেন, "আমরা মেটাতে চাইছি জনাব। আপনার হেল্প ছাড়া তো সেটা সম্ভব না।"

ইজাজ দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলল, "আমরা কি একবারও বলেছি আমরা মেটাতে চাই না? আপনি মেয়েটাকে পাঠিয়ে দিন, মেয়েটা স্বামী সংসার করুক, বাচ্চা হোক, সুখ পাক, আর কিছু তো চাইনি।"

সুশোভন বললেন, "প্রথমত মেয়েটা কোথায় আছে, আমরা কেউ জানি না জনাব। দ্বিতীয়ত এবং সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, মেয়েটা স্বেচ্ছায় বিয়েটা করেনি। ফোর টুয়েন্টি করে বিয়েটা হয়েছিল, তথ্য গোপন করে। এক্ষেত্রে ছেলেটি দোষী হয়।"

ইজাজ হাত বাতাসে ঘুরিয়ে সুশোভনের দিকে তাকিয়ে বলল, "ওতে কী হয়? কটা বিয়ে স্বেচ্ছায় হয়? মেয়েমানুষের আবার ইচ্ছা অনিচ্ছা বলে কিছু হয় নাকি? বিয়ে হয়েছে মানে ও মেয়ে রুবেলের স্ত্রী, কনভার্শন হয়েছে মানে ও মেয়ে এখন মুসলিম। কহানি খতম।"

জামান এতক্ষণ চুপ করে বসে শুনছিলেন। ইজাজের কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠলেন। ইজাজ বলল, "কী হল সাহেব?"

জামান বললেন, "আপনি দারুণ কথা বললেন কিন্তু মল্লিকবাবু। আই অ্যাম হাইলি ইমপ্রেসড। এত সোজা সব কিছু?"

ইজাজ বলল, "আপনি একজন মুসল্লি হয়ে এই কথা বলছেন জনাব? কিনে নেওয়া জাজ দিয়ে বাবরি মসজিদের রায় ঘুরিয়ে দেওয়া হল। আপনার খুন ঘুমিয়ে ছিল তখন? সবখানে আমাদের মুসলিম ভাইদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে, আমরা সংখ্যালঘু হয়ে পড়ছি, আপনি তখন কোথায় ছিলেন?"

জামান সুশোভনের দিকে তাকালেন, "দেখলে সুশোভন, তুমি জাস্ট একজন গেরুয়াপন্থী আর আর-একজন ইজাজ মল্লিককে পাশাপাশি বসাও। দেখবে কথাগুলো জাস্ট রিফ্লেক্ট করে যাবে। গেরুয়াপন্থী বলে যাবে কাশ্মীরে যখন পণ্ডিতদের বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছিল, তখন তুমি কোথায় ছিলে? আর এখানে মল্লিকবাবুরা এসব বকে যাবেন। মল্লিকবাবু", জামান সাহেব মল্লিকের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনি একজন

জনপ্রতিনিধি হয়ে এসব বলতে পারেন না। ঠান্ডা মাথায় ভাবুন সমস্যাগুলো কীভাবে বাড়তে চলেছে।"

ইজাজ মল্লিক বলল, "আপনি কী চান?"

জামান বললেন, "আমরা একটা স্থিতাবস্থায় আসি। মেয়েটাকে টিভির মাধ্যমে জানাই, তুমি যা সিদ্ধান্ত নেবে, তাই আমরা মেনে নেব। তুমি যদি চাও সংসার করতে, করো। না চাইলে ইউ আর ফ্রি টু গো। আর আমি চাই, এই অ্যানাউন্সমেন্টটা আপনি করুন।"

ইজাজ বাজে ভাবে হেসে উঠে বলল, "কী সব বলে যাচ্ছেন জামান সাহেব। নিজের ধর্মের মানুষের প্রতি আপনার কোনও সহানুভূতি নেই?"

জামান বললেন, "এই চেয়ারটায় বসলে আমার কাছে সবাই সমান। এ দেশের সংবিধান আমাকে সেটা শিখিয়েছে।"

ইজাজ বলল, "এ দেশের সংবিধান সবাই মানছে? খোদ হিন্দুরাই মানছে?"

জামান বললেন, "কুড়ি শতাংশ হিন্দুরা মানছে না। বাকি আশি শতাংশ হিন্দুরা মানছে বলেই এখনও দেশে শান্তি আছে। একটা মুসলিম কান্ট্রি আর একটা সেকুলার কান্ট্রি

লাইক ইন্ডিয়ার মধ্যে এই কারণেই এখনও হেল অ্যান্ড হেভেন ডিফারেন্স মল্লিক সাহেব। আমি ভুল বলছি?"

ইজাজ রেগে গেছিল। জোরে জোরে হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, "আপনার ইমান আপনি বন্ধক রেখে দিয়েছেন জামান সাহেব। আপনি নিজেও জানেন না, আপনি কী ভয়ংকর কথা বলছেন।"

জামান ঠান্ডা গলায় বললেন, "আমি অনেক সহানুভূতিশীল হয়ে কথাটা বলছি। সত্যিকারের ভয়ংকর রূপ দেখাতে চাইলে ওই রুবেল শেখ নামের ছেলেটাকে লাঠি দিয়ে আগাপাশতলা পেটাতাম, সঙ্গে ওকে যারা মদত দিচ্ছে তাদেরও। পুলিশ কিছু করে না, আমাদের হাত পা বাঁধা বলে আমরা চুপ করে থাকি। আপনার কাছে একটা ফেবার চাইছি, আপনি সেটা দয়া করে করে দিন। নইলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার্থে আমাকে মাঠে নামতে হবে।"

ইজাজ গম্ভীর মুখে জামানের দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনি আমাকে হুমকি দিচ্ছেন জামান সাহেব।"

জামান বললেন, "হুমকি দিচ্ছি না, রিকোয়েস্ট করছি মল্লিকসাহেব। অত্যন্ত ভদ্রভাবে, হাতজোড় করে আপনাকে রিকোয়েস্ট করছি। পুলিশের হুমকি এত নরমভাবে হয় না,

জানেন বোধহয়। আপনার অন্যান্য ব্যবসাও তো আছে মল্লিকসাহেব। কেন সেগুলো অকারণ হ্যাম্পার করবেন বলুন?"

ইজাজ মল্লিক লাল চোখে জামান সাহেবের দিকে তাকিয়ে রইল।

৪৭

খবরের কাগজ এসেছিল। আদিত্য স্নান করে এসে সেটাই দেখছিল। রুমকি আদিত্যকে খেতে দিয়ে বলল, "আজ ওদের মিটিং-এ কী হবে কে জানে।"

আদিত্য বলল, "পজিটিভ ভাবছি।"

রুমকি বলল, "কী পজিটিভ ভাবছ? আমার বোনটার তো যা সর্বনাশ হবার হয়ে গেছে।"

আদিত্য বলল, "কীরকম সর্বনাশ? কোনও মেয়ে রেপড হলে কি সব শেষ হয়ে যায়?"

ঝুমকি দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল। রুমকি ঝুমকির দিকে তাকিয়ে বলল, "তুই ঘরে যা।"

আদিত্য খাওয়া থামিয়ে বলল, "না। কোনও ঘরে যেতে হবে না। ঝুমকি। এদিকে আয়। বস।"

রুমকি থমথমে মুখে আদিত্যর দিকে তাকাল। ঝুমকি ইতস্তত করে চেয়ার নিয়ে বসল।

আদিত্য রুমকির দিকে তাকিয়ে বলল, “আমি কয়েকটা কথা পরিষ্কার করে বলি। এবার মনে হয় এগুলো বলার সময় হয়েছে। বলি?”

রুমকি বলল, “তোমার অফিসের দেরি হয়ে যাবে।”

আদিত্য বলল, “হোক না। এতদিন তো যাওয়াই হয়নি। আজ নাহয় দেরি হবে। কিন্তু কথাগুলো বলা দরকার।”

রুমকি বলল, “বেশ। বলো।”

আদিত্য বলল, “ঝুমকি একটা ভুল করেছে। ঝুমকির বয়স আঠেরো বা উনিশ। এই বয়সে সবাই ভুল করে। ঝুমকিও করেছে। বয়সটাই খারাপ। কলেজে একজন সুপুরুষ ছেলে দেখে প্রেমে পড়েছে, সেটাকে আমি ভুল বলছি না। ভুল বলছি, কোনও কিছু যাচাই না করে, বাড়িতে কিছু না বলে, অন্ধের মতো ছেলেটার সঙ্গে চলে গেছে এবং যাওয়ার পরে বুঝেছে সে বিরাট ভুল করেছে। আমি ভুল বলছি ঝুমকি?”

ঝুমকি মাথা নাড়ল।

আদিত্য বলল, "আমি অনেক ভেবেছি। সুশোভনের সঙ্গেও কথা বলেছি। আমার মনে হয়েছে, আমাদের সমাজের মূল সমস্যা হল ভিক্টিম ব্লেমিং। একটা মেয়ের রেপ হলে দোষটা মেয়েরই হয়। কেন মেয়েটা রাত করে বাড়ি ফিরেছিল, কেন মেয়েটা ছোটো পোশাক পরেছিল ইত্যাদি ইত্যাদি। এক্ষেত্রে ভিক্টিম ব্লেমিংটা শুধু সব দিক দিয়ে হল। এমনকি পালিয়ে গেছিল বলে রাগের মাথায় ঝুমকিকে ডিসওন অবধি করা হচ্ছিল। যাই হোক, সেসব মিটেছে। ঝুমকিকে জোর করে রিন্টু ধানবাদ নিয়ে গেল এবং ওর মতের অমতে ওকে রেপ এবং কনভার্ট করতে গেল। যদিও কনভার্ট করা অত সোজা না, ঝুমকির কনসেন্ট না থাকলে সেটা হবেও না, তবু, আমাকে বলো তো, এত কিছুর মধ্যে ঝুমকি কী করল? রেপ হলেই সব শেষ হয়ে যাবে? ঝুমকির কি রিন্টুর প্রতি বিন্দুমাত্র ভালোবাসা আছে? থাকলে বলুক। কি রে ঝুমকি, আছে?"

ঝুমকি বলল, "আমি যখন জানতে পারলাম রিন্টু আমাকে মিথ্যে কথা বলেছে, তখন থেকেই আমার ওর প্রতি সব ভালোবাসা নষ্ট হয়ে গেছে।"

আদিত্য বলল, "এবং অপরাধবোধ এসেছে। তাই তো?"

ঝুমকি মাথা নাড়ল।

আদিত্য রুমকির দিকে তাকাল, "তুমি ঠিক কী করে মনে করো ঝুমকির সর্বনাশ হয়ে গেছে?"

রুমকি কেঁদে ফেলে বলল, "ওকে কেউ বিয়ে করবে না। কে বিয়ে করবে বলো তো ওকে?"

আদিত্য বলল, "ঝুমকির ক্লাস টুয়েলভে নাইন্টি ফাইভ পারসেন্ট ছিল না?"

রুমকি বলল, "তাতে কী হয়?"

আদিত্য বলল, "একটা মেয়ের জীবনে বিয়ে করাটাই কি সব? ঝুমকির যা মেধা আছে, ও চাইলে হায়ার স্টাডি করতে পারে। রিসার্চ করতে পারে। নিজের পায়ে চাকরি করতে পারে। তুমি কী করে ওকে একটা চার দেওয়ালের মধ্যেই কল্পনা করতে পারছ? এদিক দিয়ে ভাবলে ওই রিন্টু শেখ, আর আমাদের মধ্যে পার্থক্যটা কোথায় রুমকি? ওরাও ওকে বাড়ির চাকর বানিয়ে রাখত, আমরাও তাই করছি।"

রুমকি বলল, "বাবা মানবে না।"

আদিত্য বলল, "মানতে হবে। দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে হবে। আমাদের সমাজের সবথেকে বড়ো সমস্যাই তো লোকে কী বলবে? এই লোকের দৃষ্টিকে পাত্তা যারা দেয়নি, তাদের জন্যই আমাদের সমাজটা পালটেছে। সতীদাহ প্রথা আটকালে লোকে কী বলবে ভাবেননি বলেই রামমোহন সেটাকে আটকাতে পেরেছিলেন। বিধবাবিবাহ হলে লোকে

কী বলবে, স্ত্রীশিক্ষার প্রসার হলে লোকে কী বলবে ভাবেননি বলেই বিদ্যাসাগরের কৃপায় এখনও দেশে পড়াশোনা জিনিসটা টিকে আছে। সিভিল সার্ভিস ছেড়ে দিলে লোকে কী বলবে ভাবেননি বলেই নেতাজি নেতাজি হতে পেরেছিলেন। বাবাকে মানতে হবে। ঝুমকিকে পড়াশোনা করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। কি রে ঝুমকি, পারবি না?”

রুমকি ঝুমকিকে ধরে কেঁদে ফেলল। আদিত্য বলল, “কেঁদো না। কেঁদে কেঁদে নিজেদের পজিটিভ এনার্জিগুলোকে ভাসিয়ে না দিয়ে মেয়েটাকে সাহস দাও। আর হ্যাঁ, তোমাদের দুজনের সামনে আমি বলে দি, ঝুমকি আমার বোনের মতোই। ওকে নিয়ে আমাকে সন্দেহ কোরো না দয়া করে। আমি তোমাদের খারাপ চাই না। ভালো চাই। প্লিজ। দয়া করে বোঝো। এই ক্রাইসিস সিচুয়েশনে আমার যা করণীয়, তা আমি করেছি। এ ছাড়া আর কিছু করার ছিল না।”

রুমকি চেয়ারে বসে বলল, “আমাকে ক্ষমা করে দিয়ো। আসলে পরিস্থিতিটা এমন হয়ে গেছিল...”

আদিত্য বলল, “অফিস গেলাম। দয়া করে কোথাও বেরিয়ো না। ওরা নজর রাখছে, মাথায় রেখো।”

ঝুমকি বলল, “রাখব। সাবধানে যেয়ো।”

৪৮

বাদশাহ হুমায়ুন হারেমে প্রবেশ করেছেন। মেহজাবিনকে চোখ উপড়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তার আর খোঁজ পাওয়া যায়নি।

হারেমের মেয়েরা তাঁকে শাহি স্নান করিয়ে রাধার কাছে নিয়ে গেছে। রুকসানা বাদশাহর সঙ্গে এসেছিল। হুমায়ুন রাধাকে বললেন, "ভালো আছ?"

রাধা ঘাড় নাড়ল।

বাদশাহ হাতের ইশারায় রুকসানাকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বললেন। রুকসানা বেরিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়ে গেল।

বাদশাহ বললেন, "মেহজাবিন তোমাকে নিয়ে এসেছিল। তুমি জানতে মেহজাবিন গদ্দার ছিল? আমার ভাই কামরান মির্জাকে ও এখানকার সব খবর পাচার করত?"

রাধা অস্ফুটে বলল, "না।"

বাদশাহ স্বগতোক্তি করলেন, "স্বাভাবিক। তুমি জানবেই বা কী করে? তোমার ভাষাশিক্ষা হল এই সেদিন। এসো।"

রাধা বাদশাহের কাছে এল।

বাদশাহ রাধার ওষ্ঠ চুম্বন করলেন। রাধা শিউরে উঠল। বাদশাহ রাধাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "কী চাও তুমি?"

রাধা বাদশাহের বক্ষলগ্না হয়ে ছিল। সে ফুঁপিয়ে উঠল।

বাদশাহ রাধার চিবুক তুলে ধরে বললেন, "শাহি হারেম থেকে কাউকে বাড়ি ফেরানো সম্ভব নয়। আমি জানি তুমি কী চাও। আমি তোমার গৃহে শাহি উপহার পাঠিয়েছিলাম। তোমার পিতা সমস্ত দ্রব্য প্রত্যাখ্যান করেছেন।"

রাধার দু চোখ বেয়ে জলের ধারা নামল।

বাদশাহ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে উঠে রাধার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, "আল্লাহ তোমায় ভালো রাখুন। আমি এলাম।"

বাদশাহ হুমায়ুন রাধার ঘর থেকে বেরিয়ে আর কারও ঘরে গেলেন না। হারেম ছেড়েই বেরিয়ে গেলেন। রুকসানা এসে রাধার ঘরে ঢুকে বলল, "কি রে, বাদশাহ এত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন কেন?"

রাধা মুখ গুঁজে কাঁদছিল। কিছু বলল না।

রুকসানা বলল, "মেহজাবিনের জন্য আমরা সবসময় ভয়ে থাকি। এই বুঝি বাদশাহের সেপাইরা এসে আমাদের নিয়ে গিয়ে চোখ উপড়ে নেয়। ওর সঙ্গে তো আমাদেরই সবথেকে বেশি কথা হত। এখন আবার তুই এই নৌটংকি শুরু করেছিস। কী হয়েছে বলবি?"

রাধা বলল, "আমি বাবার কাছে যাব।"

রুকসানা রাধার খাটের ওপর বসে পড়ে বলল, "আব্বার কাছে যাবি? আম্মির কাছে যাবি? আমাদের সে পথ বন্ধ হয়ে গেছে। চাইলেও আর যেতে পারবি না।"

রাধা নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল।

একজন মেয়ে এসে রুকসানাকে ডাকল, "আপনাকে বাদশাহ ডেকেছেন।"

রুকসানা একটু শিউরে উঠে সামলে নিয়ে বলল, "আসছি।"

বাদশাহ হারেম ছেড়ে চলে গেছিলেন। আবার ফিরে এসে জলাশয়ের কাছে চুপ করে বসে ছিলেন। রুকসানা গিয়ে মাথা নুইয়ে দাঁড়াল, "হুজুর, তলব করেছিলেন?"

বাদশাহ বললেন, "আমি যুদ্ধ করতে যাব মনস্থ করেছি। হারেম থেকে একশো জন জেনানা আমার সঙ্গে যাবে। তুমি ব্যবস্থা করো।"

রুকসানা মাথা নোয়াল, "হুজুর।"

বাদশাহ বললেন, "আর ওই মেয়েটি মনে হয় বাড়ি যেতে চায়। ওকে বাড়ি পাঠানোর ব্যবস্থা করছি।"

রুকসানা স্তম্ভিত হয়ে বাদশাহের দিকে তাকিয়ে বলল, "তা কী করে হয় হুজুর? বাদশাহি হারেম থেকে কেউ তো..."

বাদশাহ বললেন, "বাদশাহ চাইলে না হওয়ার কিছু নেই। আমি ব্যবস্থা করতে বলছি। তুমি ওই মেয়েটিকে বলে দিয়ো।"

রুকসানা বলল, "হুজুরের যা আদেশ।"

বাদশাহ বললেন, "তুমি যাও। এখানে যেন কেউ আমাকে বিরক্ত না করে। আমার একা থাকতে ইচ্ছা করছে।"

রুকসানা মাথা নুইয়ে চলে গেল।

রাধা তখনও কাঁদছিল। রুকসানা রাধাকে গিয়ে জড়িয়ে ধরল, "ওরে মেয়ে, তোর কী ভালো নসিব! স্বয়ং বাদশাহ তোকে বাড়ি ফেরাবেন বলেছেন।"

রাধা অবিশ্বাসী চোখে রুকসানার দিকে তাকাল। কিছুক্ষণের মধ্যে তার মুখ হাসিতে পরিপূর্ণ হল।

রুকসানা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "তোর এই হাসিটা যেন থাকে রে মেয়ে।"

রাধা রুকসানাকে জড়িয়ে ধরল।

রুকসানা বলল, "জাহাঁপনা তোর মধ্যে কী দেখলেন কে জানে। সবসময় আত্মমগ্ন হয়ে থাকেন। সবাই ঠিকই বলে, হুজুর যে কখন কী করবেন কেউ জানে না। এই কারও চোখ উপড়ে দিচ্ছেন, তো এই কাউকে গরিব থেকে আমির করে দিচ্ছেন। শাহি অনুগ্রহ পেয়েছিস, খুশি হ মেয়ে।"

রাধা আবার কাঁদতে শুরু করল।

এবার আনন্দাশ্রু।

৪৯

আদিত্য অফিস বেরিয়ে যাওয়ার পরে রুমকি বলল, “ঝুম।”

ঝুমকি বলল, “বল।”

রুমকি ওর সামনের চেয়ারে বসে বলল, “তোর মনে আছে, ছোটোবেলায় বাবা তোর জন্মদিন কত বড়ো করে করত? তোর স্কুলের সবাইকে বলত?”

ঝুমকি মাথা নাড়ল, “হুঁ।”

রুমকি ঝুমকির হাত ধরল, “শোন না ঝুম, মনমরা হয়ে যাস না। আমরা আছি তো। কিচ্ছু হবে না।”

ঝুমকি বলল, “তুই জামাইবাবুকে আমাকে নিয়ে কী বলেছিস?”

রুমকি একটু থতোমতো খেয়ে বলল, “কী বলব বল? এগুলো কাপল প্রবলেম বুঝিস না?”

ঝুমকি বলল, "আমি জামাইবাবুকে সবসময় নিজের দাদা ভেবে এসেছি। এখানে এসে কোনওরকম ইনসিকিউরিটি ফিল করিনি যে জামাইবাবু কোনও উলটোপালটা কিছু করতে পারে। আর তুই..."

ঝুমকি মাথা নিচু করল।

রুমকি ঝুমকির কাঁধে হাত দিল, "এগুলো তুই বুঝবি না ঝুম। পুরুষমানুষদের বিশ্বাস করতে নেই। ওরা বিশ্বাসযোগ্য নয়। তুই নিজেই দেখ তোর লাইফ দিয়ে। এই যে, কী যেন ছেলেটা, রিন্টু না কী, তোকে কী সব মিথ্যে কথা বলে নিয়ে গিয়ে কী করল? তুই বল!"

ঝুমকি বলল, "তাহলে তো বাবাকে বিশ্বাস করা যায় না। তুই বল না, তুই বিশ্বাস করিস, বাবা মাকে লুকিয়ে অন্য কোনও মহিলার সঙ্গে..."

রুমকি ঝুমকিকে ধরে একটা ঝাঁকুনি দিল, "এসব কী বলছিস তুই? তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি? বাবা কোনও দিন এরকম করতে পারে? সাত্ত্বিক ভদ্রলোক একজন। পাড়ার সবাই বাবাকে দেখলে মাথা নিচু করে। আর তুই বাবার নামে এসব বলে যাচ্ছিস?"

ঝুমকি বলল, “তুই যাকে ভালোবাসিস, বিয়ে করেছিস, তুই যদি তার সম্পর্কেও এরকম ভাবতে পারিস, তাহলে বাবাকে নিয়ে ভাবতেই বা তোর অসুবিধাটা কোথায়? ছোটোবেলা থেকে একসঙ্গে বড়ো হয়েছিস, আর এটুকু চিনতে পারলি না আমাকে?”

রুমকি বলল, “না। চিনতে পারলাম না। যদি চিনতে পারতাম, তাহলে যদি বিন্দুমাত্র বুঝতাম, তুই ওই ছেলেটার সঙ্গে প্রেম করছিস সবাইকে লুকিয়ে, তাহলে তোকে জুতিয়ে সিধে করে দিতাম। তোর কপাল ভালো যে আমি এখানে ছিলাম। বাড়িতে থাকলে তো ঠিকই বুঝতাম। শোন, তোর ওই ছেলেটার সঙ্গে কবে থেকে ফিজিক্যাল রিলেশন ছিল? সত্যি করে বল। হোটেলে যেতিস?”

ঝুমকি বলল, “এসব কী বলছিস?”

রুমকি বলল, “না বলার কী আছে? তোর রস উঠেছিল, রসের ঠ্যালায় এসব করেছিস। খুব মজা না? কাটা তো ওদেরটা? মজা পেয়েছিস?”

ঝুমকি বিস্ফারিত চোখে দিদির দিকে তাকিয়ে বলল, “এসব কথা তুই বলতে পারছিস?”

রুমকি বলল, “তুই করে আসতে পারলে আমি বলতে পারব না কেন? কেন করেছিস?”

ঝুমকিকে ক্রমাগত চড় মারতে মারতে কান্নায় ভেঙে পড়ল রুমকি, "আমাদের বাড়ির মান সম্মান সব ধুলোয় মিশিয়ে দিলি তুই। আমি ভাবতেও পারছি না একটা মুসলমানের সঙ্গে গিয়ে... ছি ছি ছিছি... ইশ!!! আমি লোকের সামনে মুখ দেখাব কী করে বল তো?"

ঝুমকি বলল, "তুই কী চাস দিদি? আমি সুইসাইড করি?"

রুমকি ঝুমকিকে আবার চড় মারল, "সুইসাইড করলে নামটা আরও বাড়বে তাই না? এক কাজ করা যাক, আমি, বাবা, মা সবাই মিলে সুইসাইড করি। এই নষ্ট মেয়েছেলে, ছেলেটা তোর ভিতরে ফেলেছিল না?"

ঝুমকি বুঝতে পারল না, বলল, "কী?"

রুমকি বলল, "যখন সেক্স করেছিল, তখন তোর ভিতরে ফেলেছিল, তাই তো? ওরা তো প্রোটেকশন ইউজ করবে না। অশিক্ষিতের বাচ্চা ওরা। ভিতরে ফেলেছিল কি না বল।"

ঝুমকি চোখ মুখ শক্ত করে বলল, "আমি মনে করতে পারছি না। ওই সময় আমার তলপেটে প্রচণ্ড ব্যথা হচ্ছিল। এত কষ্ট হচ্ছিল বলে বোঝাতে পারব না।"

রুমকি বলল, "তা তো হবেই। মজা করতে গেছিলি। দেখ কেমন মজা লাগে। এই তোর ডেট কবে?"

ঝুমকি বলল, “সামনেই। কুড়ি তারিখ।”

রুমকি বলল, “বেঁধে গেলে ওই কাটার বাচ্চা নিয়ে ঘুরবি?”

ঝুমকি বলল, “না। বাচ্চা নষ্ট করব।”

রুমকি বলল, “সব ভেবেই রেখেছিস। জানোয়ার মেয়ে। যা, স্নান কর যা। আমার গা ঘিনঘিন করছে তোকে দেখে। অসভ্য, জানোয়ার, নোংরা মেয়ে কোথাকার।”

ঝুমকি কিছুক্ষণ পাথরের মতো বসে থেকে স্নানে গেল।

৫০

আদিত্য অফিসে কাজ করছিল। ফোন বাজল। দেখল সুশোভন ফোন করছেন। ধরল, “হ্যাঁ, বল।”

সুশোভন বললেন, “ইজাজ মল্লিকের সঙ্গে বসা হল বুঝলি।”

আদিত্য নড়েচড়ে বসল, “দেন?”

সুশোভন বললেন, "এক্সপেক্ট করছি, ঝামেলাটা মিটবে। সম্ভবত ওরা মেয়েটাকে চেজ করা বন্ধ করবে।"

আদিত্য বলল, "তাহলে এখন কর্তব্য? ঝুমকিকে ওদের বাড়ি নিয়ে যাব?"

সুশোভন বললেন, "খেপেছিস? এসব ভুলেও ভাবিস না। জাস্ট ওয়েট অ্যান্ড ওয়াচ।"

আদিত্য বলল, "ওকে।"

সুশোভন বললেন, "চল কাজ কর। আর কোনও আপডেট এলে তোকে জানিয়ে দেব।"

আদিত্য বলল, "ঠিক আছে।"

সুশোভন ফোন রাখলেন।

আদিত্য রুমকিকে ফোন করল। রুমকি ধরল, "বলো।"

আদিত্য বলল, "সুশোভন ফোন করেছিল।"

রুমকি বলল, "কী বলল?"

আদিত্য বলল, "আশা করা যায় মিটে যাবে।"

রুমকি বলল, "শোনো। আমার কিছু কথা আছে।"

আদিত্য বলল, "বলো।"

রুমকি বলল, "দ্যাখো, তুমি মাথা গরম কোরো না। কিন্তু কথাটা তো সত্যি যে ঝুমকির সঙ্গে ওই ছেলেটার কিছু হয়েছে। এবার ওর ডেট কুড়ি তারিখ। যদি পিরিয়ড মিস হয়, তখন বাচ্চাটা নষ্ট করতে হবে। সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় এখনই কোনও ডাক্তার কনসাল্ট করে নেওয়া ভালো।"

আদিত্য একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "সারাক্ষণ একই চিন্তা করতে তোমার ভালো লাগে? অন্য কিছু নিয়ে ভাবতে পারো তো। আমি নাহয় নাস্তিক মানুষ, তুমি তো ঠাকুর দেবতায় বিশ্বাস করো। স্পিরিচুয়াল কিছুতে মন দাও। ঝুমকি একটা মারাত্মক স্ট্রেসের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, তুমি ওকে আরও স্ট্রেস দিচ্ছ সেটা বুঝছ?"

রুমকি একটু থমকে গিয়ে বলল, "কী করব বলো? আমার মাথা কাজ করে না। সারাক্ষণ মনে হয় এই মেয়েটা ছোটোবেলায় আমার জামা ধরে ঘুরে বেড়াত। কেউ ওকে

আমার থেকে নিতে গেলে কেঁদেকেটে বাড়ি মাথায় তুলত। আমার যখনই মনে পড়ছে ও আমাকে না জানিয়ে সব করেছে, আমি রাগটা সামলাতে পারছি না।"

আদিত্য নিজের টেবিলের চারপাশে তাকিয়ে টেবিল থেকে উঠে অফিসের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, "দ্যাখো রুমকি, এই মুহূর্তে তোমার ওপরেই চাপটা সব থেকে বেশি। তোমাকে তোমার বাবাকে সামলাতে হবে। ঝুমকিকেও সামলাতে হবে। দয়া করে সব কিছু ভেস্তে দিয়ো না। তোমার কথা-টথা শুনে ও যদি সুইসাইড অ্যাটেম্পট করে তখন কী হবে?"

রুমকি ভয় পেয়ে বলল, "কী সব বলছ? এরকম হতে পারে নাকি?"

আদিত্য বলল, "হতে পারে না? সেন্টিমেন্টাল লোকজন কখন কী করে বসে কে দেখতে যাচ্ছে? অনেক সাহস জোগাড় করে ও ফেসবুক স্ট্যাটাস দিয়েছিল। সে সাহসটা এখন ওর মধ্যে ফিরিয়ে আনো। আমরা একটা মিউচুয়াল করতে যাচ্ছি। এই সময় হয়তো সবার সামনে দাঁড়িয়ে ওকে জিজ্ঞেস করা হবে ও রিন্টুর কাছে ফিরে যেতে চায় নাকি। এমন কোনও পরিবেশ তৈরি কোরো না, যাতে ও বাড়িতে থেকে এতটাই অতিষ্ঠ হয়ে যায় যে শেষমেশ রিন্টুর কাছেই ফিরে যেতে চাইবে। তুমি কি চাও এরকম কোনও সিচুয়েশন আসুক?"

রুমকি বলল, "না না, সে কী? এসব কেন চাইব?"

আদিত্য বলল, “তাহলে দয়া করে বিহেভ প্রপারলি।”

রুমকি বলল, “আচ্ছা। চেষ্টা করব। সমস্যা হল ওকে দেখলেই কেন যে রাগ হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারছি না। নিজের বোন তো। শাসন করার অধিকারটুকু তো আছে বলো?”

আদিত্য বলল, “অবশ্যই আছে। কিন্তু এই মুহূর্তে শাসনের থেকেও ওর কেয়ারটা অনেক বেশি দরকার।”

রুমকি বলল, “আমি যখনই ভাবছি ওর পেটে ওই সমাজবিরোধীটার বাচ্চা আসতে পারে আমি শিউরে উঠছি। নিতে পারছি না। আমার গা গুলিয়ে উঠছে।”

আদিত্য বলল, “যা হয়ে গেছে কিছু তো করার নেই আর। বাচ্চা যদি নষ্ট করতে হয় করতে হবে। কী করার আছে?”

রুমকি বলল, “তুমি সাবধানে থেকো। আর আমায় ক্ষমা কোরো।”

আদিত্য বলল, “কী ব্যাপারে?”

রুমকি বলল, “আমি তোমাকে যা নয় তাই বলেছি। ঝুমকিকেও বলেছি। খারাপ লাগছে। বোনটা আমার।”

রুমকি কেঁদে ফেলল।

আদিত্য ফোন হাতে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

৫১

অফিসফেরতা আদিত্য শ্বশুরবাড়ি গেল। তপন তাকে দেখে খুশি হলেন, “ওহ, বাবা তুমি এসেছ? খবরে তো দেখাচ্ছে ওদের নেতা বলেছে মিউচুয়াল করে নেওয়া হবে। বাড়ির সামনে থেকে উটকো দলবলও সকালের পর আর দেখা যাচ্ছে না। সমস্যা কি মিটল?”

আদিত্য ঘরের ভিতর ঢুকে সোফায় বসল। রুমকির মা উদ্বিগ্ন চোখে তার দিকে তাকিয়ে। তাকে দেখে বললেন, “চা খাবে বাবা?”

আদিত্য বলল, “আপনি বসুন। আমি একটু কথা বলে যাই।”

তপন বসলেন। আদিত্যর শাশুড়িও বসলেন।

আদিত্য বলল, "আপাতত মনে হচ্ছে একটা সমঝোতায় আসা গেছে। আমার বন্ধু সুশোভন ওদের নেতার সঙ্গে কথা বলেছে। ওরা ঝুমকিকে ফেরত নেবার জন্য যে মরিয়া ভাবটা দেখাচ্ছিল, যে জ্বালাতনটা করছিল, মনে হয় না আর করবে। তবু নিরাপত্তার স্বার্থে আপাতত ঝুমকি আমাদের কাছেই থাকুক। দু-চারটে দিন গেলে নাহয় এখানে নিয়ে আসা যাবে।"

তপন খুশি হয়ে আদিত্যর হাত ধরে বললেন, "বাঁচালে বাবা। তুমি না থাকলে যে কী হত।" রুমকির মা ঠাকুরের উদ্দেশে প্রণাম করতে শুরু করলেন।

আদিত্য বলল, "ঠিক আছে। এখনই সব মিটে গেল ভেবে না নিলেই ভালো হয়। আমি ওদের ঠিক বিশ্বাস করতে পারি না। ওদের মধ্যে একটা মরিয়া ভাব আছে তো, সেটা দুশ্চিন্তার।"

তপন বললেন, "ও পুলিশ যখন স্টেপ নিয়েছে আমি নিশ্চিন্ত। আসছে বুধবার একটা ভালো দিন আছে। ওই দিন শান্তি স্বস্ত্যয়ন করে ঝুমকির দোষ কাটিয়ে ঘরে তুলব।"

আদিত্য অবাক হয়ে বলল, "দোষ কাটাবেন মানে? কীসের দোষ?"

তপনও উলটে অবাক হলেন, “দোষ না? হিন্দু ব্রাহ্মণ বাড়ির মেয়েকে মুসলিম ছেলে ফাঁসিয়ে বিয়ে করল। তারপর আর যা যা হয়েছে সেগুলো নাহয় নাই বা বললাম। দোষ তো কাটাতেই হবে।”

আদিত্য বলল, “এটা হলেই দোষ কেটে যাবে? তারপর কী করবেন?”

তপন চিন্তিত মুখে বললেন, “সেটা আমরা সবাই মিলে ঠিক করব। সৎপাত্রে বিয়ে দিতে হবে। এখন তো আর ভালো ছেলে পাওয়া যাবে না। সেই দোজবরে বা...” দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তপন।

আদিত্য শাশুড়ির দিকে তাকাল। কেমন দিশেহারা হয়ে আছেন ভদ্রমহিলা। অবশ্য সারাক্ষণ দিশেহারাই থাকেন। নিজের কোনও মতামত কোনও কালেই দেওয়ার ক্ষমতা নেই।

সে বলল, “ঠিক আছে। আমি উঠি। ফিরতে হবে।”

শাশুড়ি বললেন, “সে কী, কিছু মুখে দিয়ে যাও। গৃহস্থের অকল্যাণ হবে যে!”

তপনও বললেন, “হ্যাঁ। চা জলখাবার অন্তত খেয়ে যাও।”

অনিচ্ছাসত্ত্বেও বসল আদিত্য। তপন বললেন, "ওদের টার্গেট এটাই থাকে। হিন্দু বাড়ির মেয়েদের ট্র্যাপে ফেলে বিয়ে করবে, তারপর কনভার্ট। এ যে কত বড়ো চক্র, তা যদি আগে বুঝতাম। তাও মেয়েকে বুদ্ধিমতী বলতে হবে, পালাতে পেরেছে ঠিক করে। এখন একটা ঠিকঠাক ছেলে দেখে। আমার এক বোন আছে সাউথের দিকে। ওর কাছে পাঠাতে পারলে দোজবরেও খুঁজতে হত না, ঠিক একটা ভালো ছেলে দেখে বিয়ে দিয়ে দেওয়া যেত।"

আদিত্য বলল, "মিথ্যা বলে বিয়ে দেবেন?"

তপন বললেন, "মিথ্যার কিছু নেই তো। নামমাত্র ডিভোর্সিরাও তো বিয়ে করে। আমার মেয়ের তো বিয়েই প্রপার পদ্ধতিতে হয় না।"

আদিত্য বলল, "তবু, ছেলের বাড়ি থেকে যখন জানতে পারবে, তখন সমস্যায় পড়তে পারেন।"

তপন হাত দিয়ে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গি করে বললেন, "ও কোনও সমস্যা হবে না। এখন সব আইন মেয়েদের পক্ষে।"

আদিত্য বিস্মিত চোখে তপনের দিকে তাকাল। আদর্শবাদী লোকেরা পার্সোনাল ক্রাইসিসে পড়লে এরকম হয়ে যাবে? শেষে মিথ্যে বলে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে?

শাশুড়ি চা নিয়ে এলেন।

বললেন, “একটু বসবে বাবা, লুচি করছি।”

আদিত্য বলল, “না, না, সেসব দরকার নেই। আমি চা খেয়ে রওনা দেব। অনেকটা রাস্তা ড্রাইভ করতে হবে আবার।”

তপন বললেন, “আচ্ছা, তোমার হাতে ভালো ছেলে আছে? অফিসে বা বন্ধু মহলে?”

আদিত্য দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

মানুষ এরকম কেন? কেন?

৫২

রাতের খাবার পর আদিত্য বারান্দায় গিয়ে একটা সিগারেট ধরাল।

মাথা গিজগিজ করছে অজস্র ভাবনাচিন্তায়। কোনও কিছু গভীরভাবে ভাবতে গেলে মাথা দিচ্ছে না। সে বুঝতে পারছিল, এই চার দেওয়ালের বাইরে কোথাও একটা যাওয়া

দরকার। এই কংক্রিটের জঙ্গলে থাকলে মাথায় এসব কঠিন চিন্তাভাবনা ঘুরঘুর করবেই।

বাইরের রাস্তায় পাড়ার এক দাদু বাড়ি ফিরছেন হাঁটতে হাঁটতে। আদিত্য চোখ বুজল। জীবনটা কোথায় যেন আটকে গেছে এই সময়ে এসে। এত জটিল জীবন তো সে কোনও দিন কল্পনা করেনি! আজকাল কেন জটিলতাগুলো তাকে এরকম পরীক্ষার সামনে ফেলে দেয়?

রুমকি বারান্দায় এসে দাঁড়াল। নরম গলায় বলল, "সিগারেট না খেলে হয় না?"

আদিত্য বলল, "এই একটাই। আর খাব না।"

রুমকি বলল, "ঝুমকিকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে এলাম। খুব কাঁদছিল। আমিও যা নয় তাই বলেছি। খারাপ লাগছে আমারও।"

আদিত্য কিছু বলল না।

রুমকি বলল, "শোনো না, একটা কথা বলব, রাগ করবে না তো?"

আদিত্য বলল, "বলো।"

রুমকি বলল, “আমি একটা ব্যাপার ভেবেছি। কাউকে বলিনি, নিজের মধ্যেই রেখেছি। কিন্তু কথা দাও, বললেই ঝাঁঝিয়ে উঠবে না।”

আদিত্য বলল, “বলো। আর কী ঝাঁঝিয়ে উঠব? এনার্জি নেই কোনও আর।”

রুমকি বলল, “দ্যাখো সুশোভন তো প্রোগ্রেসিভ মাইন্ডেড ছেলে। বিয়ে থা করেনি। আবার পুলিশেও কাজ করে। ও যদি ঝুমকিকে বিয়ে করত, তাহলে ওই ছেলেটাও পুলিশের বউ বলে বেশি জ্বালাতন করত না...”

আদিত্য হেসে ফেলল।

রুমকি বলল, “হাসছ কেন?”

আদিত্য বলল, “আচ্ছা, আমরা শেষ কোথায় বেড়াতে গেছিলাম?”

রুমকি বলল, “কোদাইকানাল। কী দারুণ লংকার চপ খেলাম বলো?”

আদিত্য বলল, "তুমি এক কাজ করো। চোখ বন্ধ করে কোদাইকানালের সেই ঝরনাটার কথা মাথায় আনো। আর ঝুমকিকে পুরো মাথা থেকে বের করে দাও। দ্যাখো তো পারো নাকি।"

রুমকি অবাক হয়ে বলল, "এ আবার কী? না পারার কী আছে?

আদিত্য বলল, "না না, করো। পারা না পারার কিছু না। এই নাও, এই চেয়ারটা নাও, আমি তোমার কাঁধ ম্যাসাজ করে দিচ্ছি, তুমি ভাবো। বসো চেয়ারে।"

রুমকি চেয়ারে বসল। আদিত্য বলল, "চোখ বন্ধ করেছ?"

রুমকি বলল, "হুঁ।"

আদিত্য বলল, "কী দেখতে পাচ্ছ?"

রুমকি বলল, "দেখতে পাচ্ছি মেঘলা আবহাওয়া। বৃষ্টি পড়ছে, তবু আমি ঝরনার সামনে থেকে নড়ছি না। তুমি আবার আমার হাত ধরে টানতে টানতে গাড়িতে নিয়ে গিয়ে বলছ ঠান্ডা লাগাবে নাকি? এখানে ঠান্ডা লাগলে ডাক্তার কোথায় পাব? তারপর চপ এনে দিলে... আহা... কী ভালো... কলকাতায় কোথায় পাওয়া যাবে লংকার চপ?"

আদিত্য বলল, “এরপর দ্যাখো গাড়িটা চলল। আমরা টিটিডিসির গেস্ট হাউজের কটেজে পৌঁছলাম। ওখানে ওরা আমাদের মাছভাজা খেতে দিল। সঙ্গে ধোঁয়া ওঠা গরম ভাত। তুমি আবার ব্যাগ থেকে মাখন বের করে বললে মাখন দিয়ে ভাত খেতে ভালো লাগবে। মনে পড়ছে?”

রুমকি বলল, “হ্যাঁ। আমি মাখন ছাড়া খেতেই পারছিলাম না। ওদের তরকারিতে ওই কী সব মশলা দেয়, আমি জাস্ট নিতে পারি না। তুমি তো ওইসবই সোনা মুখ করে গিলে ফেলছিলে।”

আদিত্য বলল, “মাছভাজা আর মাখন দিয়ে ভাত খেয়ে তুমি কম্বল নিয়ে একটা জম্পেশ ঘুম দিলে। আমি হাঁটতে বেরিয়ে সাইকেলের খোঁজ পেয়ে সাইক্লিং করে যখন সন্ধেয় ফিরলাম তুমি আমাকে খুঁজে না পেয়ে কেঁদেকেটে একশা করে গেস্ট হাউজের লোকদের পাগল করে দিচ্ছ।”

রুমকি বলল, “ওরে বাবা, তুমি কী জঘন্য। ফোনটাও পাওয়া যাচ্ছিল না। উফ। কী বিচ্ছিরি!”

আদিত্য বলল, “তারপরের আদরটা?”

রুমকি আদিত্যর হাত ধরল, “হুঁ।”

আদিত্য রুমকির পাশে বসল, “চোখ খোলো।”

রুমকি চোখ খুলল।

আদিত্য বলল, “চলো ভুলে যাওয়া যাক আপাতত। এত টেনশন আর নেওয়ার দরকার নেই। আর সুশোভন তো ঝুমকিকে পছন্দ করেনি। এজ ডিফারেন্সও অনেক। জোর করে কাউকে কোনও সম্পর্কে জড়াবার কী দরকার? সময় দিই মেয়েটাকে? পড়ুক?”

রুমকি আদিত্যর হাত জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল, “আমাকে ক্ষমা করে দিয়ো। কত বাজে বাজে কথা বলেছি। ইশ... আমিও আর পারছিলাম না বিশ্বাস করো।”

আদিত্য রুমকিকে জড়িয়ে ধরে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, “বেশ করেছ যা করেছ। এবার একটু শান্তিতে ঘুমাও যাও। ভেবো না আর অন্য কিছু।”

রুমকি আদিত্যর হাত শক্ত করে ধরে থাকল।

৫৩

অফিস ঢোকার মুখে আদিত্যর ফোনটা বেজে উঠল। ধরল সে, “হ্যালো।”

“আমি রিন্টু বলছি।”

আদিত্যর চোয়াল শক্ত হল, “বলো।”

“বলছি দাদা আপনার সঙ্গে একটু দেখা করা যাবে?”

আদিত্য বলল, “কী, গুন্ডা মস্তান নিয়ে আসবে নাকি?”

“না না, দাদা, সেসব না। মিটমাট তো হয়ে গিয়েছে। মল্লিকচাচা তো বলে দিয়েছেন সব ভুলে যেতে। আমি শুধু একটু দেখা করতে চাই আপনার সঙ্গে। বিশ্বাস করুন আমি একা আসব।” গলায় আর্তি স্পষ্ট।

আদিত্য বলল, “ঠিক আছে। তুমি এসো, এতদিন আমায় ফলো করেছ, অফিসের ঠিকানা তো জানো নিশ্চয়ই, চলে এসো।”

ফোনটা রাখল আদিত্য। কয়েক সেকেন্ড চুপ থেকে সুশোভনকে ফোন করল। সুশোভন ধরলেন, “বল।”

আদিত্য বলল, “ওই রিন্টু ছেলেটা ফোন করে দেখা করতে চাইছে। এতদিন হুমকি দিত, এখন রিকোয়েস্ট করছে। আমি আসতে বলেছি।”

সুশোভন কয়েক সেকেন্ড চুপ করে বললেন, “ঠিক আছে, শোন কী বলে। নিজে থেকে কিছু বলতে যাস না।”

আদিত্য বলল, “হুঁ।”

অফিসে কিছুক্ষণ বসার পর রিন্টুর ফোন এল। আদিত্য অফিসের বাইরে বেরিয়ে দেখল রিন্টু দাঁড়িয়ে আছে। একাই এসেছে। সে চারদিকে তাকাল। কোনও গাড়ি নেই। সে বলল, “বলো কী বলতে চাও।”

রিন্টু বলল, “দেখুন, আমি মানছি আমি যেটা করেছি ঠিক করিনি।”

আদিত্য রিন্টুর দিকে তাকাল। মুখে উগ্রতার ভাবটা কম লাগছে কি? বুঝল না।

সে বলল, “বুঝলাম। তো কী দাবি এখন তোমার?

রিন্টু বলল, “দেখুন, আমি ওকে সত্যি ভালোবাসি। আমি চাই ওকে নিয়ে সংসার করতে। আপনি দেখুন না, ওর বাড়ির লোককে বুঝিয়ে।”

আদিত্য বলল, “আমি তো জানি না ঝুমকি কোথায় আছে। আমার পক্ষে ওর বাড়ির লোককে বোঝানোও সম্ভব না। আমি ওদের ফ্যামিলিতে আউটসাইডারের মতো।”

রিন্টু মাথা নিচু করে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে বলল, “আমাদের দিক থেকে যেগুলো হয়েছে, সেগুলো সত্যিই বেশি বেশি হয়ে গেছে। আমি ক্ষমা চাইছি তার জন্য।”

আদিত্য হাসল, “তুমি শিক্ষিত ছেলে না? যেগুলো করেছ, সেগুলো তো জেনেবুঝেই করেছ, তাই না?”

রিন্টু বলল, “দেখুন, আপনাকে আমি একটা কথা বলি। আমি যে ওকে ভালোবাসিনি তা নয়। শুধু আমার ধর্মটা বলতে ভয় পেয়েছি। লুকোতে চাইনি বিশ্বাস করুন। ভয় পেয়েছি এ কারণেই যে, আমি যদি ওকে আমার ধর্মটা বলতাম, ও আমাকে বিয়ে নাও করতে পারত। তারপর আমি যে কাজটা করেছি সেটাও ওকে আটকে রাখার জন্যই। জানি গর্হিত কাজ, কিন্তু আমার বন্ধুরা বলেছিল, ওর পেটে বাচ্চা চলে এলে ও আর কোথাও যেতে পারবে না। কনভার্শনটাও প্রি-প্ল্যানড ছিল না। আমার ধানবাদের মুরুব্বিরা যখন জানতে পারল, ওরা জোর দিতে লাগল যে আগে কনভার্ট করিয়ে নে। ও ধানবাদ থেকে পালিয়ে যাওয়ার পর আমার আর মাথা কাজ করছিল না। আমি মল্লিকচাচাকে জানালাম। ওরা কেসটা এমনভাবে টেক আপ করে নিল যে আমার হাতে কিছুই রইল না। আমি রাগের মাথায় আপনার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছি, পশুর মতো কাজ করেছি ওর সঙ্গে, কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি এখনও ওকে ভালোবাসি। ওর সঙ্গে সংসার করতে চাই।”

আদিত্য সিগারেট ধরাল। বলল, "ঠিক আছে, ঝুমকি যদি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে আমি জানাব।"

রিন্টু বলল, "আপনি বলুন, আমি ওর বাবার পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে আসব।"

আদিত্য বলল, "শোনো, আমার অফিসে কাজ থাকে বুঝলে? এরকম বাইরে তো বেশিক্ষণ থাকা সম্ভব না।"

রিন্টু বলল, "তাহলে রাতে আপনার বাড়ি আসি?"

আদিত্য বলল, "না। বাড়িতেও কাজ থাকে। তুমি এক কাজ করো, আমার বন্ধু সুশোভনের সঙ্গে তুমি এসব ব্যাপারে আলোচনা করো। তোমার জন্য ওর সন্দেশখালি ট্রান্সফার হয়ে গেছে, জানো তো?"

রিন্টু বলল, "উনি তো আপনাদের ফ্যামিলির কেউ না।"

আদিত্য বলল, "আমাকে এসব কথা বলে কোনও লাভ নেই। বললাম তো, তুমি এসো এখন।"

আদিত্য আর দাঁড়াল না, রিন্টুকে দাঁড় করিয়ে অফিসের ভিতর ঢুকে গেল।

৫৪

অফিসে ঢুকে আদিত্য চুপ করে বসল। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে সুশোভনকে ফোন করল। সুশোভন ফোন ধরেই বললেন, "কী বলল ছেলেটা?"

আদিত্য বলল সবটা।

সুশোভন চুপ করে থেকে বললেন, "নাটক করছে না সিরিয়াসলি বলছে? কিছু বুঝলি?"

আদিত্য বলল, "কী যে করছে আমি জানি না। আমার অসহ্য লাগছে ভাই এসব।"

সুশোভন বললেন, "দেখ যদি তোর মনে হয় ছেলেটা সিরিয়াস, সেক্ষেত্রে তোর শালির সঙ্গে ওকে একবার বসানো যেতে পারে। তোর শালি যদি ওকে ভালোবেসে থাকে..."

আদিত্য তেতো গলায় বলল, "আমার মনে হয় না ঝুমকির ওর প্রতি কোনও ভালোবাসা আছে। বরং আমার মনে হয় এটা ওর কাছে চেপে যাওয়াই ভালো। ওকে বললে ও আবার দ্বিধায় পড়ে যেতে পারে।"

সুশোভন বলল, “দ্বিধায় পড়লেও জানা। জানানোটা দরকার। ও একজন অ্যাডাল্ট। ওকে নিজের ডিসিশন নিজেকে নিতে দে।”

আদিত্য বলল, “তারপর আর-একটা ক্যাচাল লাগুক? তুই আমার শ্বশুরমশাইকে চিনিস? বুঝিসনি কীরকম গোঁড়া লোক? সবে একটা ক্যাচাল মিটল। এখন আবার ঝামেলা লেগে যাবে এসব নিয়ে আলোচনা করলে।”

সুশোভন বললেন, “দেখ ভাই, একটা কথা বলি। কাদায় অলরেডি নেমে গেছিস। এখনও যদি বলিস পাঁক ঘাটব না, তাহলে কী করে হয়?”

আদিত্য বলল, “আমার এই ছেলেটাকে পোষায়নি একবারেই। এই দুদিন আগেও হুমকি দিচ্ছিল। ওদের বাড়ির ওখানে ঝামেলা করেছে, পাড়ায় হাঙ্গামা করেছে। আমি এইসব থেকে দূরে থাকতে চাই। বোঝার চেষ্টা কর ভাই।”

সুশোভন বললেন, “ঠিক আছে। তাহলে ব্যাপারটা নিয়ে আর এগোস না। তবে ছেলেটা যদি এরপরেও তোকে জ্বালাতন করে, সেক্ষেত্রে আমাকে বলিস। আমি সেক্ষেত্রে জামান সাহেবকে দিয়ে ইজাজ মল্লিককে ফোন করাব।”

আদিত্য বলল, “সে করাবি। এই ঝামেলাটাও প্রায় মিটল, তুই কি ওইখানেই থাকবি? ট্রান্সফারের জন্য আবেদন করবি না?”

সুশোভন বললেন, "নাহ। চাকরি করাটাই আসল। যেখানে ইচ্ছা দিক না। কলকাতার থেকে এইসব দিকে পলিউশন অনেক কম। ভালোই লাগছে। ক্রাইম যদিও কম নয়, তবু ঠিকঠাক। কদিন কলকাতা থেকে দূরে থেকে শাপে বর হচ্ছে একদিকে।"

আদিত্য বলল, "দেখ যা ভালো মনে করিস। ফোন করব আবার দরকারে।"

সুশোভন হাসলেন, "একশো বার।"

ফোন রেখে আদিত্য ডেস্কে বসে কাজে মন দিল। প্রচুর কাজ জমে ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। দিনটা যে কী করে কেটে গেল বোঝা গেল না। অফিস থেকে বেরোতে বেরোতে সাতটা বাজল।

গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে দেখল রাস্তায় রিন্টু দাঁড়িয়ে আছে। সে গাড়িটা রাস্তার বাঁদিকে রেখে গাড়ি থেকে নামল, "তুমি এখনও বাড়ি যাওনি?"

রিন্টু তার দিকে তাকিয়ে বলল, "না। আমি আসলে এই এলাকাতেই ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। আমার না আসলে ভীষণ অপরাধবোধ হচ্ছে, বলে বোঝাতে পারব না। আমার উচিত হয়নি, এই ঝামেলাগুলো ইজাজ চাচার কাছে বলাটা। আপনাদের সঙ্গেও যা করেছি, ঠিক

করিনি। দেখুন না, ইজাজ চাচা ঠিক টাইমে পলিটিক্স বুঝে সরে পড়ল। সবাইকে বলে দিয়েছে আমার সঙ্গে বেশি মেলামেশা না করতে।"

আদিত্য কয়েক সেকেন্ড রিন্টুর দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি বাড়ি যাও। গিয়ে বিশ্রাম করো। যা হয়ে গেছে, সেসব তো আর পিছনে গিয়ে রেক্টিফাই করা যাবে না।"

রিন্টু বলল, "দাদা আমি সংসারটা করতে চাই। সিরিয়াসলি করতে চাই। দেখুন না কিছু করা যায় নাকি। আপনার চাইলে আমি হিন্দু হয়ে যাব। বিশ্বাস করুন। অন্য কোথাও গিয়ে সংসার করব নাহয়।"

আদিত্য কপালে হাত দিল, "আমি না তোমাদের এই হিন্দু মুসলমানের জ্বালায় পাগল হয়ে যাব। হিন্দু হয়ে গেলেই ঝামেলা মিটে যাবে? রিডিকিউলাস রিন্টু! প্লিজ আমায় জ্বালিয়ো না। যদি ঝুমকির সঙ্গে দেখা হয়, আমি তোমার কথা জানাব। ও যা ডিসিশন নেবে, সেটাই ফাইনাল হবে। ঠিক আছে?"

রিন্টু অন্যমনস্ক ভাবে অন্য দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি খুব বাজে করেছি। ইজাজ চাচা লোক দিত, তাদের দিয়ে আমি ভাবতাম আমি বিরাট কোনও ডন হয়ে গেছি। আপনাকে কী না কী বলেছি। এখন বুঝতে পারছি, সব রাজনীতির খেলা।"

আদিত্য রিন্টুর পিঠে হাত দিয়ে বলল, "তুমি বাড়ি যাও। আমিও বাড়ি যাই। সময় দাও সবাইকে। যাও।"

রিন্টু হঠাৎ করে কেঁদে ফেলল।

আদিত্য রাস্তার মধ্যে অপ্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

৫৫

রাত সাড়ে নটা বাজে।

লোকাল অফিসে ইজাজ মল্লিক পারিষদ পরিবৃত হয়ে বসে ছিল। এলাকার কোন ক্লাবে অনুদান দেওয়া হবে সেসব নিয়ে কথা হচ্ছিল।

রিন্টু ঢুকল থমথমে মুখে। চোখ লাল। ইজাজ মল্লিক আড়চোখে রিন্টুর দিকে একবার তাকিয়ে বলল, "কী ব্যাপার শেখ? এরকম গম্ভীর হয়ে আছিস কেন?"

রিন্টু উত্তর না দিয়ে একটা চেয়ার টেনে বসল।

ইজাজ মল্লিকের একজন পারিষদ রশিদ। সে রেগে গেল, "কি রে রিন্টু, তোকে মল্লিকচাচা কী জিজ্ঞেস করছে উত্তর দিচ্ছিস না কেন?"

রিন্টু রশিদের দিকে তাকিয়ে বলল, "তোকে জিজ্ঞেস করেছেন? কুকুরের মতো ভৌ ভৌ করছিস কেন?"

রশিদ রিন্টুর দিকে তেড়ে যেতে গেল। ইজাজ হাত দিয়ে তাকে আটকাল, "এই রশিদ। তোরা দূরে যা। রিন্টুর সঙ্গে ঝামেলায় যাচ্ছিস কেন? ওর মনখারাপ।"

রিন্টু ইজাজের দিকে তাকিয়ে রাগি গলায় বলল, "সব আপনার জন্য হয়েছে। আপনি শুরু থেকে আমাকে মিসলিড করলেন। এখন পালটি খাচ্ছেন নিজের স্বার্থে। টাকা খেয়েছেন?"

এবারেও সবাই রিন্টুর দিকে তেড়ে গেল।

ইজাজ মল্লিক হাতের ইশারায় সবাইকে থামিয়ে বলল, "দেখ রুবেল, তুই কিন্তু বাড়াবাড়ি করছিস। তুই যেটা করেছিস সেটাও তো ঠিক করিসনি! মেয়েটাকে রেপ করার কী দরকার ছিল?"

রিন্টু বলল, "আপনি তাহলে আগে বলেছিলেন কেন, যা করেছিস বেশ করেছিস? এখন কেন আবার এসব বলছেন?"

ইজাজ বলল, "শোন বেটা, শোন। মাথা গরম করিস না। সব কিছু বুঝে শুনে চলতে হয় তো। গোটা শহর জুড়ে কেসটা বেকায়দায় চলে গেছে। তোর ওই মেয়েটা, কী যেন নাম, যাই নাম হোক, সে সবাইকে বলে বেরিয়েছে তুই ওকে রেপ করেছিস। আমাদের গোটা কমিউনিটিরই বদনাম হচ্ছে। এমনিতেই সবাই বলে আমাদের নাকি তোষণ করা হয়, তার উপরে সামনে ভোট আসছে। এখন যদি এই ব্যাপারটা নিয়ে আমরা ঝামেলা চালিয়ে যেতাম তাহলে কি সমস্যা কমত? শোন বেটা, মাথা ঠান্ডা কর। কদিন পর দেখছি, আমিই এনে দেব ওই মেয়েছেলেকে তোর কাছে।"

রিন্টু চেয়ার থেকে উঠে চেয়ারটা টান মেরে ছুড়ে ফেলে দিয়ে বলল, "কাউকে কিছু দেখতে হবে না। সবাই নিজের ধান্দা দেখুন। দেখতে হবে না কিছু।"

বাকিরা আবার রিন্টুর দিকে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল, ইজাজ মল্লিক আবার আটকাল। রিন্টু বেরিয়ে চলে গেল।

রশিদ বলল, "ফালতু ছেলে চাচা এই রিন্টু। আমরা শুধু শুধু এর জন্য ফাইট দিচ্ছিলাম। সম্মান করতেই শেখেনি দেখলেন?"

ইজাজ বলল, "ঠিক আছে, ও সব ঠিক হয়ে যাবে। দুদিন ছেলে এদিক সেদিক ঘুরবে, মদ মারবে। তারপর আবার কোনও একটা মেয়ের পাল্লায় পড়ে যাবে। দাঁড়া, আমি ওর

মাকে বলে ওর ভালো ঘর দেখে নিকাহর ব্যবস্থা করছি। বয়স বুঝিস না, এই বয়সে শরীর গরম থাকে। আমার এত বয়সেও গরম কমল না, আর শেখের তো কচি বয়স।”

রশিদ বলল, “যাই বলুন চাচা, দু ঘা দেওয়ার দরকার ছিল। আপনি না থাকলে ও খেয়েও যেত। এত বড়ো সাহস হয় কী করে এখানে এসে ঝামেলা করার?”

ইজাজ বলল, “ঠিক আছে। ও দেখে নেওয়া যাবে। এখন বল তোদের ক্লাবের জন্য যে টাকা দেব, সেটা কোন খাতে দেখাবি?”

রশিদ মাথা চুলকে একটু ভেবে হাসিমুখে বলল, “নাইটে একটা ফুটবল টুর্নামেন্ট লাগিয়ে দি।”

ইজাজ বলল, “ঠিক আছে। বাকি সব পকেটে ভরবি, নাকি রে?”

রশিদ অভিমানী গলায় বলল, “কী যে বলেন চাচা, সব কি আমি একা খাই নাকি? ক্লাবের মুরুব্বিরা আছে না?”

ইজাজ বলল, “তাও ঠিক। তোরা তো খুব সৎ, তাই না রশিদ? কি রে, আব্বাস, তুই চুপ করে আছিস কেন?”

আব্বাস কিছু বলার আগেই ঘরটায় রিন্টু একছুটে উদ্যত রিভলভার হাতে ঢুকে একদম সামনে থেকে ইজাজ মল্লিককে পরপর গুলি করতে লাগল। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই ইজাজ মল্লিকের রক্তাক্ত শরীরটা চেয়ার থেকে মেঝেতে পড়ে গেল।

রশিদ রিন্টুকে ধরতে এল। রিন্টু রশিদকেও গুলি করল। গুলি কাঁধের কোনায় লাগল। রশিদ পড়ে গেল। সবাই এবার ভয় পেয়ে অফিস থেকে বেরোতে এলোপাতাড়ি দৌড় শুরু করল।

রিন্টু রিভলভারটা ইজাজ মল্লিকের মৃতদেহে ছুড়ে মেরে তার মাথায় একটা লাথি মেরে বলল, "শালা, শুয়োরের বাচ্চা।"

৫৬

আদিত্য, রুমকি আর ঝুমকি খেতে বসেছিল।

ঝুমকি ভাত নিচ্ছিল না। আদিত্য বলল, "কি রে, তুই কি ডায়েট করছিস নাকি? ভাত নিচ্ছিস না কেন?"

ঝুমকি বলল, "দিদি আর আমি বিকেলে একগাদা চিপস খেয়েছি। পেট ভর্তি।"

রুমকি বলল, "ফুচকাও এনেছিলাম। অনেকদিন পর দুই বোন মিলে খেলাম।"

আদিত্য বলল, “ভালো করেছ।”

রুমকি বলল, “শোেো না, বাবার সঙ্গে কথা হয়েছে। বাবার কয়েকজন বন্ধু আছে। ওরা ওই সভা-টভা করে। ওরা বলেছে ঝুমকির প্রায়শ্চিত্তটা করিয়ে দেবে।”

আদিত্য খেতে খেতে ঝুমকির দিকে তাকাল। ঝুমকি ভাবলেশহীন মুখে খেয়ে যাচ্ছিল।

সে বলল, “করাবে। তোমাদের বাড়ির ব্যাপার, যা যা করতে হবে করাবে।”

রুমকি বলল, “মানে তুমি এই অনুষ্ঠানগুলোতে থাকবে তো? বাবা জিজ্ঞেস করছিল আর কি! না থাকলে বাজে দেখাবে।”

আদিত্য বলল, “দ্যাখো, আমি তো অফিস যাইনি কদিন, অনেক কাজ পড়ে আছে। এই মুহূর্তে আমাকে রবিবারেও অফিসে যেতে হবে। তাই ধরেই নিতে বলো আমি থাকব না।”

রুমকি বলল, “চেষ্টা করো।”

আদিত্য খাওয়া থামাল, “যদি যাওয়া সম্ভব হত, তাও যেতাম না। তুমি খুব ভালো করে জানো। ঘরের মেয়েকে ঘরে ফিরতে হলে তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে এই কনসেপ্টটাই আমি মানতে পারছি না।”

রুমকি বলল, “এরকম বলছ কেন? স্বয়ং সীতাকেও অগ্নীপরীক্ষা দিতে হয়নি?”

আদিত্য বলল, “সেটা কি সীতা মেনে নিয়েছিলেন? পাতালপ্রবেশ করেননি? কি রে ঝুমকি, তোর প্রায়শ্চিত্ত করালে তুই সেটা মেনে নিবি?”

ঝুমকি একবার রুমকির দিকে তাকিয়ে তার দিকে তাকাল, “আমাকে এখন বাবা যা বলবে তাই তো করতে হবে। আমার হাতে কি কিছু আছে? এমনিতেই বাড়িতে কী অপেক্ষা করছে কে জানে।”

আদিত্য দুই বোনের দিকে তাকিয়ে খেতে শুরু করল। রুমকি বলল, “অকারণ রাগারাগি না করে স্রোতের সঙ্গে চলো আপাতত। অকারণ ঝামেলা করে কি আর লাভ আছে? পাড়ায় মুখ দেখানোরও তো ব্যাপার আছে একটা। ঝুমকি লাইভ করেছে (লাইভ করল কোথায়?) বলে, নইলে দেখিয়ে দিতাম ছেলেটা ওকে ছোঁয়ওনি।”

আদিত্য বলল, “তাতে কী হবে? পাড়ার লোকে কী বলল, তাতে কী আসে যায়?”

রুমকি বলল, “সারাক্ষণ এ কাকিমা, সে জেঠিমা আমাদের বাড়ি আসে। মাকে ইনিয়েবিনিয়ে উলটোপালটা কথা শোনায়। ভালো লাগে? তুমি মেয়েদের দিকটা বুঝবে না। মা এতদিন বড়ো মেয়ের জামাই নিয়ে কত গর্ব করেছে, এদিকে ছোটো মেয়ে যে কী করে বসল...”

রুমকি বাঁ হাত দিয়ে চোখ মুছল। ঝুমকি একটা কথাও না বলে পাথরের মতো মুখ করে খেতে থাকল।

আদিত্যর মাথায় রক্ত চড়ছিল। সে আর কিছু না বলে খাওয়া শেষ করে বারান্দায় গিয়ে সিগারেট ধরাল।

ফোন বাজছিল। সে দেখল সুশোভন, বলল, “কী রে? বল।”

সুশোভন বললেন, “টিভি দেখছিস?”

আদিত্য বলল, “না না। কেন?”

সুশোভন বললেন, “নিউজ চ্যানেল দেখ। তারপর ফোন কর।”

আদিত্য বেডরুমের টিভি অন করে নিউজ চ্যানেল দিল। ব্রেকিং নিউজে দেখাচ্ছে খিদিরপুরে হত্যাকাণ্ড। রুবেল শেখ নামের এক যুবক ইজাজ মল্লিককে প্রকাশ্যে গুলি করে খুন করে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। ধৃত যুবক রশিদ আলি মোল্লা নামের এক যুবককেও গুলি করে আহত করেছে। এলাকায় সন্ত্রস্ত পরিবেশ।

রুমকি খবর শুনে এঁটো হাতেই বেডরুমে চলে এসেছিল। খবরটা দেখে আর্তনাদ করল। ঝুমকিও এল। নির্লিপ্ত চোখে খবরটা দেখে মেঝেতে বসে পড়ল। আদিত্য রুমকিকে বলল, "তুমি ঝুমকিকে সামলাও। আমি সুশোভনকে ফোন সেরে আসি।"

টিভি বন্ধ করে বারান্দায় গিয়ে সুশোভনকে ফোন করল আদিত্য। সুশোভন ফোন ধরেই বললেন, "দেখলি?"

আদিত্য বলল, "তার মানে আমার সঙ্গে কথা বলার পরে ছেলে এ কাণ্ড করল?"

সুশোভন বললেন, "হুঁ। তোদের জন্য ভালোই হল। এক ঢিলে দুই পাখি টাইপ। আপাতত এদিক দিয়ে তোর শ্বশুরবাড়ির দিকে আর কোনও ক্যাচাল যাবে না যা বুঝলাম।"

আদিত্য বলল, "হুঁ। সব কি এত সোজা হবে?"

সুশোভন হাসলেন, “লেটস হোপ।”

৫৭

রাত এগারোটা।

লোডশেডিং হয়েছে। ইনভার্টার কাজ করছে না। রুমকি মোমবাতি খুঁজে জ্বালিয়েছে ডাইনিং টেবিলে। তারা তিনজন অন্ধকারে বসে আছে।

ঝুমকি চুপ করে বসে আছে।

রুমকি বলল, “ঝুম, তোর মনের মধ্যে কী চলছে বলবি?”

ঝুমকি বলল, “কিছু চলছে না।”

রুমকি বলল, “আমাদের কী হয় জানিস তো, যখন কোনও ইনফ্যাচুয়েশন আসে, তখন তার সব ভালো লাগে। সেই ঝড়টা যখন চলে যায়, আমরা বুঝতে পারি কত বড়ো ভুল করেছিলাম। তুই আমাকে খুলে বল। তোর কি এখনও ওর প্রতি কোনও ফিলিংস আছে?”

ঝুমকি চুপ করে থাকল। ঘরবাড়ি নিস্তব্ধ। শুধু রাস্তায় গাড়ি চলে যাওয়ার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

আদিত্য বলল, "ঝুমকি কিছু বলতে না চাইলে থাক। জোর করে বলার দরকার নেই।"

ঝুমকি এবার মুখ খুলল, "না, ঠিক তা নয়। জোর করার কিছু নেই। একটা কুকুর পুষলেও তার ওপর মায়া জন্মায়। ভুল করে হোক আর যে করেই হোক, আমি তো ওকে ভালোবেসেছিলাম। ওকে নিজের থেকেও বেশি বিশ্বাস করেছিলাম। তারপর আমার সব কিছু ভেঙেচুরে দিল ও।"

রুমকি বলল, "তুই কী চাইছিস?"

ঝুমকি বলল, "আমার কী চাই সেটা তো বরাবর বাবাই ঠিক করে এসেছে। একবার শুধু আমি ঠিক করেছিলাম। সেটা এত বড়ো একটা সমস্যা তৈরি করল। আমার আর নিজের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা নেই, সাহসও নেই।"

আদিত্য বলল, "এই মুহূর্তে রিন্টু জেলে থাকবে। আত্মসমর্পণ করেছে মানে এই অধ্যায় ফুরাল। কাল তোকে তোর বাড়ি নিয়ে যাব। নতুন করে সব শুরু করার চেষ্টা কর। তোর বাবা যেসব লোকাচার বা ঘর ওয়াপসি টাইপের জালি জিনিসপত্র করবে, মেনে না নিলেও চুপ করে সহ্য কর। আর কী বলব?"

রুমকি রেগে গেল, "তুমি আমার বাবাকে জালি বললে কেন?"

আদিত্য শান্ত গলায় বলল, "তোমার বাবাকে বলিনি। তোমার বাবার কাজকর্মকে বলছি। ওসব শুদ্ধি-ফুদ্ধি করে এতদিন যন্ত্রণা সহ্য করা মেয়েটাকে যে আরও যন্ত্রণা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে, সেটা বোঝার চেষ্টা করো।"

রুমকি বলল, "তুমি যেটা বোঝো না সেটায় ঢুকতে যাও কেন? আমাদের পরিবারের ব্যাপারে তোমাকে ঢুকতে হবে না। কোনও ধর্মকে ছোটো করার অধিকার তোমাকে কেউ দেয়নি।"

আদিত্য বলল, "ধর্ম যখন কোনও মানুষের বেঁচে থাকাটাকেই নষ্ট করে দেয়, দুমড়ে মুচড়ে দেয়, তখন সে ধর্মের আমার কাছে কানাকড়িও মূল্য নেই। যে ধর্ম ভালোবাসাকে ব্যবহার করে একটা সদ্যযৌবনা মেয়েকে ধর্মান্তরিত করে, তাকে ফেরাতে আর-একদল তাকে আবার কোনও প্রাণীর পেচ্ছাপ খাওয়ায়, সেসব ধর্ম আমার কাছে মূল্যহীন। অ্যাম আই ক্লিয়ার?"

রুমকি বলল, "তুমি আমার বাবাকে, আমাদের বাড়ির সমস্ত কিছুকে অপমান করছ তুমি বুঝছ?"

আদিত্য বলল, "আর ধর্মের নামে কতগুলো বিকৃত কাজকর্ম করে তোমরা যে মানুষের বেঁচে থাকার ইচ্ছাটাকেই নষ্ট করে দিচ্ছ, সেটা কি বুঝছ?"

রুমকি বলল, "আমার আর এসব নিয়ে তর্ক করার ইচ্ছে নেই। কাল আমি ঝুমকিকে বাড়ি নিয়ে যাব, ব্যস।"

আদিত্য বলল, "বেশ তো। তবে আমি আমার আপত্তিটা বলে রাখলাম। এতদিন কিছু বলিনি, কারণ লোকাচার মানাকে আমি কখনোই খারাপ চোখে দেখিনি। এখন বলতে বাধ্য হচ্ছি। যেটুকু আস্তিকতা ছিল আমার মধ্যে, ঝুমকির ঘটনা তার সবটুকু নষ্ট করে দিয়েছে। মানুষকে বাঁচতে দিচ্ছে না এই নব্য ধার্মিকরা। এসব কী শুরু হয়েছে? একদল বিয়ে করার নামে ধর্মান্তর করবে, আর-একদল তার হাত ধরে টানাটানি করবে, এসব তো মধ্যযুগে হত? এই দুহাজার কুড়িতে আমরা কি আবার পিছন দিকে হাঁটতে শুরু করলাম নাকি?"

ঝুমকি বলল, "বাবা যা চায় করুক, করে যদি মনে শান্তি পায়, করুক।"

আদিত্য হাসল, "হেরে গেলি দেখলি? সেই সেন্টিমেন্টের কাছেই হেরে গেলি।"

রুমকি বলল, "তোমাকে বললাম তো, আমাদের ফ্যামিলির ব্যাপার আমরাই বুঝে নেব।"

আদিত্য বলল, “এখন যখন ঝামেলা মিটেছে তখন ব্যাপারটা তোমাদের ফ্যামিলির হয়ে যাবে সেটা আমিও বুঝেছিলাম, তবে একটা জিনিস আমি এখন থেকেই তোমাকে বলে রাখলাম, তোমার বাবা যদি আমার সামনে রুমকির ঘর ওয়াপসির ব্যাপারে একটা কথাও বলেন, আমি কিন্তু শুনে আসব না। আমি প্রতিবাদ করব। তাতে তোমার বাবার প্রেশার বাড়লে আমাকে দোষ দেবে না।”

রুমকি থমথমে মুখে আদিত্যর দিকে তাকাল।

৫৮

রাত সাড়ে বারোটা।

রুমকি পাশে চুপ করে শুয়ে আছে। আদিত্য বুঝতে পারছে রুমকি ঘুমায়নি। সে চোখ বন্ধ করল। কারেন্ট এসেছে একটু আগে।

আদিত্যর রিন্টুর মুখটা মনে পড়ছিল। ও কি তার মানে সত্যিই ঝুমকিকে ভালোবেসেছিল? নাকি প্ল্যানটা অনেক আগে থেকেই ছিল? আগে ফাঁসাবে ভেবেছিল, পরে ভালোবেসে ফেলল!

অদ্ভুত মানুষের মন। এই মনের রহস্যের কিনারা করা হয়তো মিস্টার হোমসেরও অসাধ্য।

ঘরে নাইটবালব জ্বলছে। নাইটবালবের সবজেটে আলোয় একটা টিকটিকি দেখা যাচ্ছে। দেওয়ালেই ঘুমাচ্ছে। ঘুমাচ্ছে কি? নাকি শিকার ধরার জন্য বসে আছে? বোঝা যায় না। কে যে শিকারি, আর কে যে ঘুমিয়ে থাকে, কিছুই বোঝা যায় না। রিন্টু শহরের একজন প্রভাবশালী মানুষকে প্রকাশ্যে খুন করেছে। যাবজ্জীবন নিশ্চিত, ফাঁসিও হতে পারে। ওদের মধ্যে অস্ত্র পাওয়া এত সোজা? তারও তো মাঝে মাঝে ইচ্ছা করেছে টিমলিডারকে গুলি করে উড়িয়ে দিতে, হয়তো রিন্টুর মতো অস্ত্র পেয়ে গেলে করেও ফেলত। আসল কথা তো অ্যাভেলেবিলিটি অফ ওয়েপন। সেটা পাওয়া গেলে অনায়াসে অনেক মানুষই রুবেল শেখ রিন্টু হয়ে যেতে পারত। পায় না বলে। আমেরিকায় কোনও কোনও কলেজ স্কুলে তো প্রায়ই কোনও ছেলে বন্দুক নিয়ে ঢুকে পড়ে একে তাকে মেরে দেয়। পুরোটাই হতাশা থেকে করে। রিন্টু ঝুমকিকে আদৌ ভালোবেসে কাজটা করেছে? নাকি হেরে যাওয়ার মানসিকতা ওকে এতটা হিংস্র করে দিল? সবাই গাছে তুলে মই কেড়ে নেওয়ার পর যে অসহায়তা আসে, তার থেকেই হয়তো এই কাজটা করে ফেলল সে। আদিত্যর এখনও বিশ্বাস হচ্ছিল না, এরকম মানুষ সত্যিই আছে যারা শুধুমাত্র ধর্মের কারণে কাউকে বিয়ে করতে পারে। ভাব ভালোবাসার মধ্যে ধর্ম কেন আসবে? কী অদ্ভুত! ভালো লাগছিল না কিছুই। সময় বড়ো দ্রুত পালটে যাচ্ছে। পৃথিবীর সত্যিই গভীরতর অসুখ এখন।

"তুমি বাবার নামে কথাগুলো ঝুমকির সামনে না বললেই ভালো করতে।"

রুমকি হঠাৎ করে বলে উঠল।

আদিত্য শুধু বলল, "হুঁ।"

রুমকি বলল, "ওকে এখন বাড়ি নিয়ে যাওয়া দরকার। ও কি চিরকাল এ বাড়িতে থাকবে?"

আদিত্য বলল, "আমি শুধু বলেছি উলটোপালটা কিছু দেখলে আমি প্রতিবাদ করব। সেটা আমি করব।"

রুমকি বলল, "তুমি বুঝতে পারছ না। আমাদের মতো কনজারভেটিভ ফ্যামিলিতে এটা মেনে নিতে হবে। লোকগুলো অশান্ত হয়ে আছে। দিনের পর দিন এত মানসিক চাপ নিতে হয়েছে। এখন যদি ওরা একটু ভালো থাকতে চায় তাহলে সমস্যা কোথায়? এতদিনের বিশ্বাস কি তুমি একটা বিপ্লব করে ভেঙে দিতে পারবে?"

আদিত্য বলল, "কাল সকালে ক্যাব ডেকে দেব। তুমি ঝুমকিকে দিয়ে এসো। আর কিছু বলব না কোনও দিন। খুশি?"

রুমকি বলল, "হুঁ, আমি মাঝে মাঝে একটু বেশিই বলে ফেলি। কী করব, বাড়ির অবস্থাটা দেখা যায় না। আমি দেখতে পারি না।"

আদিত্য বলল, "ঠিক আছে, ঘুমাও এখন। আমার অফিসে ভাইটাল মিটিং আছে কাল। গুড নাইট।"

রুমকি বলল, "গুড নাইট।"

#

ভোরবেলা আদিত্যকে ঠেলে তুলল রুমকি, "এই শোনো, ওঠো, শিগগিরি ওঠো।"

আদিত্য ঘুমচোখে বলল, "কী হল?"

রুমকি বলল, "ঝুমকি চলে গেছে।"

আদিত্য অবাক হয়ে বলল, "মানে? কখন গেল?"

রুমকি একটা কাগজ আদিত্যর দিকে এগিয়ে দিয়ে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, "পড়ো।"

আদিত্য কাগজটা নিল। লেখা—

"দিদি,

আমি জানি আমি ভুল করেছি। আমি এও জানি, সারাজীবন আমার ভুলের জন্য আমার পরিবার আমায় কোনও দিন ক্ষমা করতে পারবে না। তোদের কষ্টটাও বুঝতে পারি। সবার সব চিন্তা, ঝগড়া, ঝামেলা আমাকে নিয়ে। আমি আর বোঝা হয়ে থাকতে চাই না। খুঁজতে চেষ্টা করিস না। ভালো থাকিস তোরা। জামাইবাবুকে সন্দেহ করিস না। আমার নিজের দাদার থেকেও বেশি সম্মান করি ওকে।

বাবা-মার খেয়াল রাখিস। ওরা জানুক, ওদের একটাই মেয়ে ছিল। আর-একটা মেয়ে নাহয় জন্ম দিতে গিয়ে মারা গেছিল। ধানবাদ থেকে পালিয়ে এসে ভেবেছিলাম ভুল শোধরানো গেল। বুঝলাম যা ভুল করেছি, তা তো শুধরালই না, বরং সবাইকে আরও অনেক ঝামেলায় ফেলে দেব যত দিন যাবে। এর থেকে না থাকাই ভালো।

ভালো থাকিস।

তোর ঝুম।"

৫৯

দ্বিপ্রহর।

শীত পড়ছে গ্রামে।

ব্রাহ্মণ হরি মিশ্র ঠাকুরকে ভোগ দিয়ে ক্লান্ত শরীরে মন্দিরে বসে আছেন।

রাধা হারিয়ে যাওয়ার পর থেকে শরীর ভঙ্গুর হয়েছে। নিজেই বুঝতে পারছেন এ জীবন আর বেশি দিন নেই। হরির স্ত্রী কাত্যায়নী মন্দিরে এসে বললেন, "খাবেন না?"

হরি বললেন, "ইচ্ছে করচেনে বামনী, তুমি খেয়ে নাও।"

কাত্যায়নী বললেন, "আপনি না খেলে আমি খেতে পারি? আসুন। খেয়ে নিন।"

হরি উঠলেন না। বিমর্ষ মুখে বসে রইলেন।

কাত্যায়নী বললেন, "কৈবর্তদের কে একজন কাশী থেকে এয়েচে, সংবাদ দিল বিশ্বম্ভর আসতে পারে।"

হরি বললেন, "আসুক। ওকেই এই মন্দিরের দায়িত্ব নিতে হবে।"

কাত্যায়নী খানিকটা শিউরে উঠে বললেন, "এ কথা কেন বলচেন আপনি?"

হরি ম্লান হেসে বললেন, “সময় ফুরিয়েচে বামনী। আমার আয়ু শেষ হয়ে এসেচে।”

কাত্যায়নী মুখে আঁচল চাপা দিলেন, “এমন অশুভ কথা বলতে নেই। বিশ্বনাথ আমাদের মরণ বাঁচনের ভার নিয়েচেন। তিনি আমাদের দেখবেন, আপনি চিন্তা করবেন না।”

তাঁদের চমকে দিয়ে দুজন অশ্বারোহী মন্দিরের সামনে এসে পৌঁছল। হরি সচকিত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। কাত্যায়নী ঘোমটা দিয়ে দাঁড়ালেন।

হরি বললেন, “কী চাই?”

অশ্বারোহী অত্যন্ত উদ্ধতভাবে ঘোড়া থেকে নেমে দাঁড়াল। হরি কাত্যায়নীকে বললেন, “তুমি ঘরে যাও বামনী।”

কাত্যায়নী আতঙ্কিত সুরে বললেন, “গ্রামের লোকেদের ডেকে আনব?”

হরি বললেন, “তুমি ঘরে যাও। কাউকে ডাকতে হবেনে।”

কাত্যায়নী সভয়ে কুটিরে রওনা হলেন।

অশ্বারোহী দুজন নিজেদের মধ্যে পুস্তু ভাষায় আলাপ করছিল বলে হরি মিশ্র কিছুই বুঝতে পারলেন না। তিনি গঙ্গার জল ছিটিয়ে দিলেন মন্দিরের সামনে, যাতে জাত না জানা ওই দুজন বুঝতে পারে মন্দিরের কাছে তাদের আসতে বারণ করা হচ্ছে।

কিছুক্ষণ পরেই বেশ কয়েকজন সৈনিক পরিবেষ্টিত হয়ে একটা পালকি মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়াল। হরি মিশ্র বিস্ফারিত চোখে দেখলেন রাধা পালকি থেকে নামল। নিজের মেয়েকেই চিনতে পারলেন না তিনি। কোথায় সেই গ্রাম্য রূপ আর কোথায় এই সুললিত সাজ। রাধার শিক্ষক ব্রাহ্মণকে বাদশা রাধার সঙ্গে পাঠিয়েছিলেন। তিনি হরি মিশ্রকে বললেন, "আপনার মেয়েকে বাদশা আপনার কাছেই ফেরত পাঠিয়েছেন।"

গ্রামের লোকজন খবর পেয়ে চলে এসেছিল। তারা ভিড় করে দাঁড়িয়ে বিস্মিত হয়ে রাধাকে দেখছিল। কিছু বলতে পারছিল না সৈনিকদের দেখে। মোগলরাজের সৈনিক তারা আগে দেখেনি, কিন্তু তাদের অস্ত্রবর্মপরিবৃত চেহারা ভয় ধরাবার মতোই।

রাধা হরির দিকে ছুটে আসতে গেলে হরি হাত তুলে বারণ করে বললেন, "ওখানেই দাঁড়া। বাদশা পাঠিয়েছেন মানে?"

বাঙালি ব্রাহ্মণ জানালেন রাধা বাদশার হারেমে সসম্মানে ছিল। তাকে বাদশা ফেরত পাঠিয়েছেন।

হরি মিশ্র শিউরে উঠে কাঁপতে কাঁপতে মন্দিরের ভিতরে গিয়ে বসে বললেন, “ও মেয়ে আমার মরে গেচে। ওকে নিয়ে যাও।”

রাধা মাটিতে বসে কাঁদতে শুরু করল। কাত্যায়নী এসেছিলেন। দূর থেকে রাধাকে দেখে দৌড়ে যেতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

মা বাপ আর মেয়ে কত কাছে থেকেও তাদের দূরত্ব যেন কয়েক কোটি কিলোমিটারের হয়ে গেল।

হরি মিশ্র বললেন, “ওকে নিয়ে যান। এখানে ওর কোনও জায়গা নেই।”

রাধার দুচোখ দিয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছিল। সে মাটিতে গড়িয়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে অজ্ঞান হয়ে গেল।

কাত্যায়নীর কষ্টে বুক ফেটে যাচ্ছিল, কিন্তু কিছুই বলতে পারলেন না। কলসি এনে সৈনিকদের একজনকে দিলেন। তারা রাধার মুখে জলের ছিটা দিয়ে রাধার জ্ঞান ফেরাল।

রাধা অসহায় চোখে বাবা-মার দিকে তাকিয়ে চোখের জল মুছে পুনরায় পালকিতে গিয়ে বসল।

কিছুক্ষণের মধ্যে বাদশার সৈনিকরা পালকি নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

হরি মিশ্র মন্দিরের চারদিকে গঙ্গাজল দিয়ে শুদ্ধ করে ঘরে যেতে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন।

গ্রামের বৈদ্য হরির নাড়ি দেখে মাথা নেড়ে বিমর্ষভাবে কাত্যায়নীকে বললেন, “শেষ মা জননী। সব শেষ।”

কাত্যায়নী পাথরের মতো বসে রইলেন।

৬০

গঙ্গার ধারে ওরা দুজন বসে ছিল।

সুশোভন আর আদিত্য।

সুশোভন সিগারেট ধরিয়ে বললেন, “আমরা একটুও এগোইনি। কিংবা এগিয়ে ছিলাম, আবার পিছিয়ে যাচ্ছি। ধর্ম, ধর্ম, ধর্ম করেই সব শেষ হয়ে যাবে।”

আদিত্য কিছু বলল না। রুমকি ভীষণ কান্নাকাটি করছে। সর্বত্র খোঁজ নেওয়া হয়েছে। ঝুমকির কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

সুশোভন বললেন, "মানুষ ভুল করে। প্রায়শ্চিত্তও হয়। কিন্তু মেয়েদের ভুলে মনে হয় কোনও প্রায়শ্চিত্ত হয় না। তোর শ্বশুর খুশি নিশ্চয়ই এখন? তিনি তো বলেই দিয়েছিলেন তেনার মেয়ে মারা গেছে ধরে নিয়েছেন।"

আদিত্য দীর্ঘশ্বাস ফেলল, "বাদ দে। মানুষ যদি মনুষ্যত্ব ভুলে তার মস্তিস্ককে কুসংস্কার দিয়ে ঢেকে রাখে তখন তার আর কিছু পড়ে থাকে না। মেয়েটা পালিয়ে বেঁচে গেল। থাকলে যে লাঞ্ছনা সহ্য করতে হত, তা কহতব্য না।"

দুজন প্রেমিক প্রেমিকা হেঁটে যাচ্ছিল। সুশোভন দেখে বললেন, "মানুষ প্রেম করার সময় কখনও ভেবে প্রেম করে জাত ধর্ম কী? যারা করে, তারা কি আদৌ প্রেম করে? এরা জানে কী হতে চলেছে?"

আদিত্য বলল, "আমার মনে হয় খুব শিগগিরি আমাদের এই জায়গাগুলোও উত্তরপ্রদেশ বা হরিয়ানা টাইপের হয়ে যাবে। লোকে আবার নতুন করে জাত নিয়ে মারপিট শুরু করবে। অনার কিলিং করবে। এর সপক্ষে বলারও লোক থাকবে। এবং দেখবি, আমার মনে হয় খুব শিগগিরি সতীদাহ প্রথাও হয়তো শুরু হয়ে যাবে। ধর্মরক্ষার্থে সব যখন হচ্ছে, এটা আর বাকি থাকে কেন?"

সুশোভন বললেন, "চেনা শহরটা কেমন বদলে গেল চোখের সামনে।"

আদিত্য বলল, "ইজাজ মল্লিকের পর এখন কে যাবে ওর জায়গায়?"

সুশোভন বললেন, "রশিদ।"

আদিত্য বলল, "দেখাটা করেই আসি চল।"

সুশোভন বললেন, "সিগারেটটা শেষ করে নি।"

#

জেলের প্রয়োজনীয় কাজকর্ম সেরে আদিত্যকে নিয়ে সুশোভন জেলের ভিতরে ঢুকল।

ভিজিটরস চেম্বারে আলাদা করে ডাকা হয়েছে রিন্টুকে।

আদিত্য দেখল রিন্টুর চোখের তলা কালো, আধাখ্যাঁচড়া দাড়ি, বিক্ষিপ্ত চুল। তাদের দেখে খানিকটা সিঁটিয়ে গেল রিন্টু।

সুশোভন বললেন, “কী খবর রিন্টুবাবু? জেল ঠিক লাগছে?”

রিন্টু ম্লান হাসল।

সুশোভন বললেন, “এত বড়ো কাজটা করে ফেললে?”

রিন্টু অন্য দিকে তাকিয়ে বলল, “আমি ভুল করেছিলাম আগে। পরে সেটাকে ঠিক করার চেষ্টা করলাম বলতে পারেন।”

সুশোভন বললেন, “নিজের হাতে আইন তুলে নেওয়াটাও ভুল। একটা ভুল দিয়ে আর-একটা ভুলকে কি ঠিক করা যায়?”

রিন্টু আদিত্যর দিকে সরাসরি তাকাল, “ওর কোনও খোঁজ পেলেন?”

আদিত্য বলল, “ও আমার বাড়িতেই ছিল এতদিন।”

রিন্টু হাসল, “আমার মনে হয়েছিল কয়েকবার। তারপর? এখন নিশ্চয়ই ও খুব খুশি? পথের কাঁটা সরে গেল?”

আদিত্য বলল, “সেসব আর জেনে তুমি কী করবে?”

রিন্টু বলল, "হ্যাঁ। সব নিজের হাতে শেষ করলাম। একদম প্রথমেই আমার পরিচয় দিলে হয়তো এত কিছু হত না বলুন?"

আদিত্য সুশোভনের দিকে তাকাল।

সুশোভন বললেন, "ভালো থেকো রিন্টু।"

রিন্টু বলল, "শুনুন না। ও যেন ভালো থাকে, আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি। যেন খুব ভালো থাকে। আমার কথা যেন আর কোনও দিন ওর মনে না আসে, প্লিজ দেখবেন।"

সুশোভন হাসলেন, "ঠিক আছে। দেখব। আসি, কেমন?"

রিন্টু নীরবে কাঁদতে থাকল।

আদিত্যকে নিয়ে সুশোভন বেরিয়ে এসে বললেন, "ভালোবাসায় যখন মিথ্যা আর ধর্মের কুসংস্কার যুক্ত হয় তখন কী হয়, এই কেসটা তার সবথেকে বাজে নিদর্শন হয়ে থাকল। কোনও মানে হয়, একজোড়া যুবক যুবতি ভালোবাসবে আর তাদের মনের ভিতরে ক্রমাগত একে অপরকে ঘিরে অবিশ্বাস পাক খাবে?"

আদিত্য বলল, “বাদ দে। আমি যাই, বুঝলি? আমারও আর কিছু ভালো লাগছে না। ঝুমকির কোনও খবর পেলে দেখিস।”

সুশোভন আদিত্যর কাঁধে হাত রেখে বললেন, “রিন্টু জানল ঝুমকি ভালো আছে। জানল না, ঝুমকিও হারিয়ে গেছে সেই সমাজেরই রক্তচক্ষু থেকে বাঁচতে। এটাই ভালো হল, বল?”

আদিত্য আর কিছু বলল না।

বলার মতো কিছু খুঁজে পেল না আর...